দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

শিকাগো সম্ভাষণের
১২৫ বর্ষ
পৃঃ ১২

মিথ্যাবাদী ও
পাষণ্ডেরা
পরাভূত হোক
পৃঃ ২০

৭০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭।। ২৫ ভাদ্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

স্বামী বিবেকানন্দের
শিকাগো ভাষণের
১২৫ বর্ষ স্মরণে

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২৫ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১১ সেপ্টেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

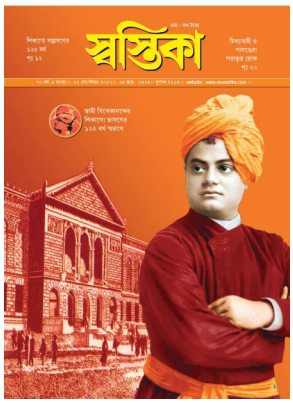

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : নরেন্দ্র মোদী মিথ্যেবাদী, অঙ্ক তবে সত্যি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১৯

তালাকের শিকার মহিলাদের রক্ষার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণ ▯ ১১

শিকাগো-সম্ভাষণের ১২৫ বর্ষ ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১২

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ১৪

গদি বাঁচাতে নপুংসকতার পাঠ : অহিংসাই হিন্দুত্ব : রাম ও কৃষ্ণ তবে কে দিদি? ▯ প্রীতিশ তালুকদার ▯ ১৭

হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের জাতীয়তা ▯ ১৯

মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২০

বঙ্গীয় যুবককুল ও বিবেকানন্দ ▯ ড. রাকেশ দাশ ▯ ২২

চক্রান্তের তত্ত্ব তুলে কচকচানি লজ্জাকর ▯ চেতন ভগত ▯ ২৭

বাংলাদেশের হিন্দু বিতাড়ন রোধে পশ্চিম বাংলায় বিজপির প্রয়োজনীয়তা ▯ চন্দন রায় ▯ ৩০

অরন্ধনে মায়েদের ছুটি ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩১

পুথির চিত্রত পাটা ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩২

বৈদিক দেবতা পূষা ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

ঋকের স্বপ্ন আন্তর্জাতিক পদক ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৪

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের পটভূমি ▯ মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময় ও সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯ ▯

সুস্বাস্থ্য: ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা। প্রতিবারের মতো এবারেও ভিন্ন স্বাদের গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে সেজে উঠেছে স্বস্তিকা। দুর্গা পূজা বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রধান উপাদান। দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে প্রতিবার, প্রতিটি পুজো সংখ্যায় স্বস্তিকা বাঙালির সেই আত্মপরিচয়ের পরিসরটি আরও বিস্তৃত করার প্রয়াস নিয়ে এসেছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লিখেছেন এই সময়ের যশস্বী লেখকরা।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

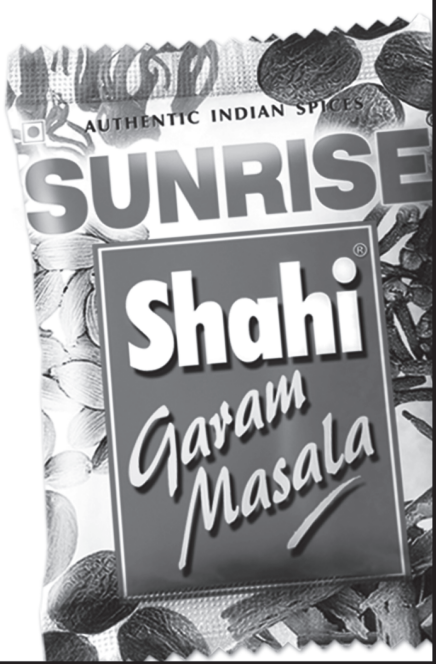

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

ডোকলামের পর ব্রিকস : ভারতের কূটনৈতিক জয়

ডোকলাম বিবাদে ভারতের কূটনৈতিক জয় হইয়াছিল। সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে ভারতের বক্তব্যকে ব্রিকস মান্যতা দেওয়ায় এবারেও ভারতের কূটনৈতিক জয় হইল। এক বৎসর আগে গোয়ায় ব্রিকস-এর সম্মেলন হইয়াছিল। সেই সম্মেলন-শেষের ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সাউথ ব্লকের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। এইবার সেই সাফল্য অর্জন করিল ভারত এবং তাহা চীনের মাটিতে দাঁড়াইয়াই। চীন, ব্রাজিল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত—এই পাঁচ দেশের সম্মিলিত জোট ব্রিকস সম্প্রতি চীনের জিয়েমিনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে ১৭ বার সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্মেলন শুরু হইবার আগে চীনের বক্তব্য ছিল যে পাকিস্তানের সন্ত্রাস-দমননীতি লইয়া ভারতের অসন্তোষ থাকিলেও তাহা ব্রিকসের মঞ্চে আলোচনার যোগ্য নহে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীনের আপত্তি সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। আর তাহার পরই ৩০ পাতার যৌথ ঘোষণা। সেখানে বলা হইয়াছে—নিরাপত্তা পরিস্থিতি লইয়া ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি উদ্বিগ্ন। বিশেষত তালিবান, আইসিস, আল কায়দা এবং এইসব জঙ্গিগোষ্ঠীর সহযোগী ইস্টার্ন তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট (ইটিআইএ), ইসলামিক মুভমেন্ট অব উজবেকিস্তান, হাক্কানি নেটওয়ার্ক, লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ, তেহেরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান ও হিজব উত-তাহিরির হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে। লক্ষণীয়, লস্কর, জৈশ এবং হাক্কানি নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী বলিয়াই পরিচিত। ব্রিকস ঘোষণাপত্রে বস্তুত এই প্রথমবার জঙ্গি সংগঠনের তালিকা প্রকাশ করা হইল। এই বিবৃতিতে সন্ত্রাসবিরোধী বার্তা স্পষ্ট হইবার অর্থ, চীনও পাকিস্তানের ব্যাপারে সুর বদলাইতেছে। ব্রিকসের এই ঘোষণাপত্র তাই মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে ভারতকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ করিয়া দিল।

জৈশ প্রধান মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়া নিষিদ্ধ করিবার যে প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে (ইউএনও) পেশ হইয়াছিল, চীনের ভেটো প্রয়োগের ফলে তাহা কার্যকরী হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণাপত্র ভারতের পক্ষে বড় জয়। যদিও চীন তাহার ভেটো প্রত্যাহারের বিষয়টি এড়াইয়া গিয়াছে। এই যৌথ বিবৃতিতে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে যাহারা মদত দিবে তাহাদেরও দায়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দিবার অভিযোগ ভারত একাধিকবার তুলিয়াছে। ভারতের এই অভিযোগের সঙ্গে আমেরিকাও সহমত পোষণ করে। কিন্তু চীন তাহার 'বন্ধুরাষ্ট্র' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে গলা মেলায়নি। তাৎপর্যপূর্ণ হইল, এই ঘোষণাপত্রে পাকিস্তানের নামোল্লেখ না করিয়াও সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রিকসের এই ঘোষণাপত্রের ফলে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ নিঃসন্দেহে আরও বাড়িবে। ডোকলামে ভারত যে কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, ব্রিকস-এর ক্ষেত্রেও তাহা আরও একবার স্পষ্ট হইল।

সুভাষিতম্

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকত্বমনর্থায় কিম্ যত্র চতুষ্টয়ম্।।

যৌবন, ধনসম্পত্তি, ক্ষমতা ও ন্যায় অন্যায় বোধের অভাব এই চারটির প্রত্যেকটিই অনর্থের কারণ। এই চারটি যদি আবার একত্রে থাকে তাহলে বিষম অনর্থ হবে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরে প্রথম পূর্ণ সময়ের মহিলামন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গড়লেন নির্মলা সীতারমন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীসভার সাম্প্রতিক রদবদলে পারস্পরিক দপ্তর বদল ছাড়া নতুন মুখ হিসেবে যোগ দিয়েছেন আরও ৯ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক রয়েছে পুরনো মন্ত্রীসভার বাণিজ্য ও শিল্পদপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের প্রতিরক্ষা দপ্তরের

দায়িত্ব পাওয়া। ১৩০ কোটির বিশাল দেশ ভারতের প্রতিরক্ষার মতো একটি মহাগুরুত্বের দপ্তর সামলানো সব সময়ই বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিরক্ষার মতো দপ্তরে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্মলাজীর যে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দীক্ষার নিরিখে কোনও ঘাটতি নেই তা উল্লেখ করা দরকার। বিজেপিতে আসার আগে বিখ্যাত জে এন ইউ থেকে ইকনমিক্সে এমএ পাশ করার পর তিনি বিশ্বখ্যাত অডিট ও কনসালটেন্সি সংস্থা Price waterhouse coopers-এ সিনিয়র ম্যানেজার পদে ছিলেন। এর পর তিনি BBC World Service-এ কর্মরত থাকা ছাড়াও ২০০৩-০৫ অবধি জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য পদে বহাল ছিলেন। তাঁর পূর্বতন দপ্তরে তিনি যে সততা, নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তারই স্বীকৃতি এই নতুন দায়িত্ব। যেখানে সর্বদা জোড়া ফলা হয়ে আছে চীন-পাকিস্তান।

গত দশ বছরে দেশে কয়লা খনি নিয়ে নানান কেলেঙ্কারির অভিযোগের ফলে অনেক সময় কয়লা উত্তোলনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মহা সঙ্কটে পড়েছিল বড় বড় শিল্পদ্যোগগুলি, সেই বহু বিতর্কিত বিদ্যুৎ ও কয়লা দপ্তরের হাল ফিরিয়ে দেন পূর্বতন পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট পীযুষ গোয়েল। কোনও কেলেঙ্কারি তো দূরস্থান দেশে কয়লা উৎপাদন উদ্বৃত্ত হয়। এলইডি বাল্ব ও টিউবলাইটের ব্যবহার বাড়িয়ে বাজারে এ দু'টির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে সফল হন তিনি। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সংবহন ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য এনে দিয়েছেন পীযুষ। তারই পুরস্কার আরও সমস্যাসঙ্কুল দপ্তর দিয়ে তাঁর দক্ষতার পরীক্ষা— এবার রেল দপ্তর।

মহারাষ্ট্রে বেশ কয়েক বছর আগে বিজেপি-সেনা সরকারের আমলে সড়ক ও জলপথ পরিবহণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছিলেন নীতিন গডকারী। সেই থেকেই তাঁর সুনাম। মোদী সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে বছরে রাস্তা নির্মাণের গড় তিনি পূর্বতন সরকারের থেকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ভাল সড়ক নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম। গডকরি সে কাজে পুরোপুরি সফল হয়েছেন, সব রকম মানদণ্ডেই। তাই বাড়তি দায়িত্ব এল গঙ্গা নদীর পুনরুজ্জীবন যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে জলপথ পরিবহণের সাফল্য-ব্যর্থতা। দেশে এখনও সব থেকে কম খরচের পরিবহণ কিন্তু জলপথ।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'উজালা' ও 'পহল' গ্রামের গরিব পরিবারগুলির ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বলার মতো সাফল্য পেয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। গ্যাসের লক্ষ লক্ষ ভুয়ো গ্রাহকের ভর্তুকির সঙ্গে তাদের নামও বাতিল হয়েছে। কথা কম কাজ বেশির এই Anthropology-র শিক্ষক বাড়তি দায়িত্ব পেলেন দেশের তরুণ তরুণীদের দক্ষতা বাড়ানোর Skill Development দপ্তরের।

নরেন্দ্র তোমার গ্রামীন উন্নয়নে ভাল কাজ করার ফলে এখন থেকে একই চরিত্রের দপ্তর পঞ্চায়েতি রাজও সামলাবেন। অলিম্পিকসের মতো আঙিনায় পদকজয়ী কর্নেল রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোর স্বাধীনভাবে সামলাবেন ক্রীড়া দপ্তর। যোগ্য হাতেই যোগ্য দপ্তর। ডাক্তার হর্ষবর্ধন বরাবরই কাজের লোক হিসেবে পরিচিত। তাঁর হাতে থাকা পরিবেশ দপ্তর, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ছাড়াও এখন থেকে অত্যন্ত আধুনিক দপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূবিজ্ঞানের মতো বিষয়ও তাঁর দায়িত্বে এল।

রাজ্যসভায় বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সরকার পক্ষের বক্তব্য অত্যন্ত কুশলতায় বারবার তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি। তাঁর লড়াকু মেজাজের বিপরীতে একই সঙ্গে সব দলের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের বিরল গুণ নাকভিকে এগিয়ে দিয়েছে। আর বিজেপিতে তো তিনি

১৯৯৮ সালে বাজপেয়ীর আমলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ছিলেন। বাজপেয়ী জমানায় তথ্য সম্প্রচার দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ নাকভি দলের অন্যতম দক্ষ সাংসদ। একবার লোকসভা ও তিনবার রাজ্যসভার নির্বাচিত। তাঁর পূর্ণমন্ত্রিত্ব প্রাপ্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেবে। পূর্বতন অভিনেত্রী ও দলের অন্যতম নির্ভীক নেত্রী স্মৃতি ইরানি তাঁর সূচনা ও সম্প্রচার দপ্তরের সঙ্গে বস্ত্র মন্ত্রকও আগের মতোই সামলাবেন। এবার নবাগতদের দপ্তর ও ব্যক্তিগত পরিচয়গুলি দেখা যেতে পারে।

নতুন সংযোজিত ৯ জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগদান ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অত্যন্ত সফল আমলা হরদীপ পুরীর। ইনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের রাষ্ট্রদূতের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। অত্যন্ত বর্ণাঢ্য তাঁর চাকরি জীবন। তাঁকে দেওয়া হয়েছে গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়নের মতো কাজ করে দেখাবার দপ্তর।

মুম্বই পুলিশের পূর্বতন দুঁদে অধিকর্তা আইপিএস সত্যপাল সিংহ মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী হবেন। সেই সঙ্গে নীতিন গডকরীকেও সাহায্য করবেন। তিনি কিন্তু বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগেই উঁচুপদের চাকরি ছেড়ে বিজেপির লোকসভা সাংসদ হন। শুধু তাই নয়, 'বাগপত' থেকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবাদপ্রতিম জাঠ নেতা অজিত সিংহকে পরাজিত করেন।

অন্য দুই আই এ এস আধিকারিকের মধ্যে বিহারের আরা থেকে সাংসদ রাজকুমার সিংহ স্বনামখ্যাত দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজের প্রাক্তনী ও নেদারল্যান্ড থেকে ম্যাজেমেন্ট ডিগ্রি নেওয়ার পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনটাও পড়ে নেন। সুতরাং অভিজ্ঞতায় কোনও খামতি নেই। নিজ দায়িত্বে অটল রাজকুমার সিংহ ১৯৯০-এর রথযাত্রার সময় বিহারের সমস্তিপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কিংবদন্তি বিজেপি মার্গদর্শক লালকৃষ্ণ আদবানীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠাই হয়তো তাঁকে সাহায্য করল। আর আদবানীর মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। তিনি (১৯৯৮-০৪) তাঁকে তাঁর দপ্তরে যুগ্ম সচিব করে নিয়ে আসেন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কেরল ক্যাডারের প্রবীণ আই এ এস আধিকারিক আলকানমো কান্নাথানাম অত্যন্ত সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে কেরল সরকারের অতি উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছে দেশের পর্যটন, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের নতুন রক্ত সঞ্চালনের দায়িত্ব। এখানেও হাতে নাতে কিছু করে দেখাতে হবে। পুরনো যাঁদের পদোন্নতি হলো আর যাঁরা সরকারের আমন্ত্রণে যোগ দিলেন তাঁদের উভয়ের মধ্যেই কয়েকটি বিষয় সাধারণ ভাবে বিদ্যমান। সততা, নিষ্ঠা ও করে দেখাবার প্রতিজ্ঞা। অনেকে ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে নিজেদের কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাকিরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সমান সফল। প্রধানমন্ত্রী ও দেশবাসী তাঁদের কাছে আরও নজরে পড়ার মতো কিছু প্রত্যাশা করছে।

ভারতের অভূতপূর্ব কূটনৈতিক জয়

ব্রিকস সম্মেলনে পাক-সন্ত্রাসের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের অভূতপূর্ব কূটনৈতিক জয় সূচিত করে, চীনের জিয়েমেনে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে এই গোষ্ঠীভুক্ত পাঁচটি দেশ (ভারত, চীন, ব্রাজিল রাশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) এক যোগে পাক সন্ত্রাসের নিন্দা করেছে। শুধু তাই নয়, এই প্রথম ব্রিকস সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির নাম করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ইসলামি জঙ্গিবাদের নিন্দা করা হয়। যেসব জঙ্গি গোষ্ঠীর নাম সম্মেলনের যৌথ ঘোষণায় উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, তেহরিক-ই- তালিবান, হিজবুল-উত-তেহরির ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লস্কর, জইশ ইত্যাদি সংগঠন পাকিস্তানের মদতপুষ্ট। এই ঘোষণা থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত, সন্ত্রাসে মদতদাতা দেশ হিসেবে পাকিস্তানের নাম না তোলার চীনা আরজি বাকি চারটি দেশ গ্রাহ্য করেনি।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আফগান জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর লড়াইকে আমরা (ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত পাঁচটি দেশ) সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে, আমরা তালিবানি জঙ্গি কার্যকলাপে পর্যুদস্ত আফগানিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে চাই। সেই সঙ্গে আমরা ইসলামিক স্টেট, দইশ, আলকায়দা এবং এদের মদতপুষ্ট ইস্টার্ন তুর্কিস্থান জঙ্গি আন্দোলন, উজবেকিস্তানে ঘটে চলা জঙ্গি আন্দোলন, হাক্কানি নেটওয়ার্ক, লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, টিটিপি এবং হিজব-উত-তেহরিরের নাম উল্লেখ করতে চাই। এরা তুর্কিস্তানে, উজবেকিস্তানে ভারতে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে তো বটেই, আমরা যে-কোনও দেশেই সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। পৃথিবী থেকে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা দরকার। এই মঞ্চ থেকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, যে সব ব্যক্তি বা দেশ সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন জোগায়, সরাসরি সাহায্য করে বা অর্থের জোগান দেয়— বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের প্রধান কারিগর হিসেবে তারাই দায়ী থাকবেন।

যৌথ ঘোষণাপত্রে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে (এন এস জি) ভারতকে অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও সমর্থন করা হয়। বলা হয়েছে এন এস জি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়।

অর্থাৎ এন এস জি-তে ভারতকে সদস্য করার ব্যাপারে চীনের আপত্তি ধোপে টিকল না। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিকসের পাঁচ সদস্য দেশকে এগিয়ে আসার প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত বৃহৎ শক্তি হিসাবে উঠে আসছে : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ডোকলাম নিয়ে চীনের সঙ্গে বিবাদের পর ভারত বিশ্বে এক বৃহৎ শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। এতদিন চীনই ভারত-চীন সীমান্তে নিজেদের দাপট দেখিয়ে এসেছে, কিন্তু এই প্রথম তাদের পিছিয়ে যেতে হয়েছে। সামরিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ভারতকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ভারতের মূল ভাবনা ও পরিচিতির বিষয়টি ভুললে চলবে না। সঙ্ঘ আরও চায় যে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বরোজগার যোজনার উপরও জোর দেওয়া হোক। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বৃন্দাবনের কেশবধামে সঙ্ঘের তিনদিন ব্যাপী চিন্তন বৈঠকের শেষে সঙ্ঘের প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন।

তিনি আরও বলেছেন, স্বদেশী ভাবনা শুধু দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই ভাবনার প্রকাশ হওয়া উচিত। সঙ্ঘ চায়, সরকার কুটির শিল্প এবং স্বরোজগার যোজনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিক।

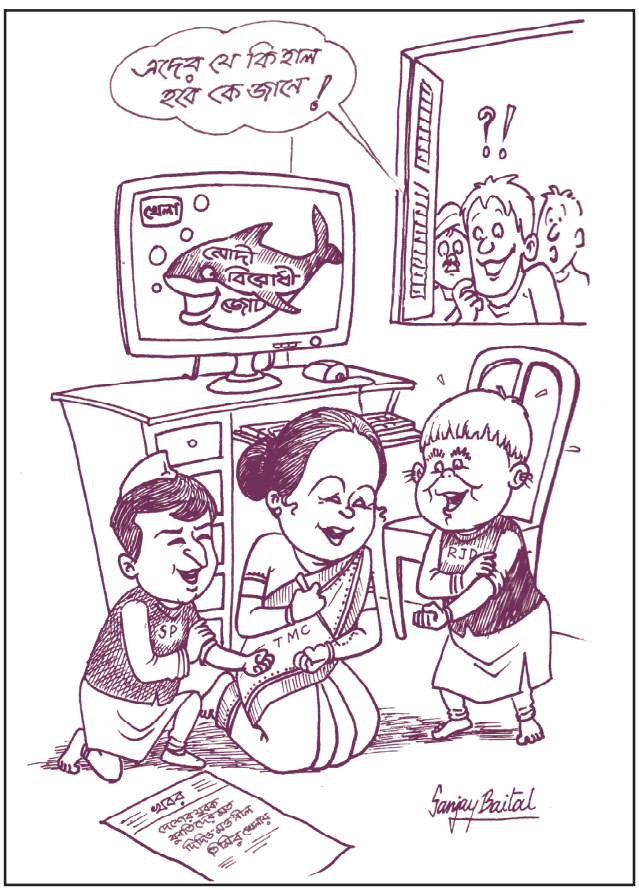

উবাচ

"চীনের সঙ্গে ডোকলাম নিয়ে বিবাদে ভারতীয় গণতন্ত্র, সেনা ও বর্তমান নেতৃত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে নিজেদের সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতা প্রমাণিত।"

কানওয়াল সিবাল
প্রাক্তন বিদেশ সচিব

জে এন ইউ পরিচালিত এক আলোচনা সভায়

"আমরা ভারতে আই এস এ-র প্রথম একটা শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমার লক্ষ্য হলো—আমরা যৌথভাবে এই কাজটা করব।"

ব্রুনে পয়োরসন
ফ্রান্সের ইকোলজিক্যাল দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী

আমেরিকার প্যারিস চুক্তি থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার প্রসঙ্গে

"আমরা যদি মনে করতাম প্রচণ্ড মারধোর করব, তা পারতাম। ২৫ আগস্টের ঘটনায় একজন নাগরিকও নিহত হননি, শুধুমাত্র গুরুর অনুগামীরা ছাড়া।"

ডাঃ অনিল জৈন
হরিয়ানা ও ছত্তিশগড়ের বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারি

গুরুমিত রামরহিমের অনুগামীদের তাণ্ডব প্রসঙ্গে

"তাঁর (উমাভারতী) কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ রান্নাঘরে সব খাবারই তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি পরিবেশনের দায়িত্বটা নিয়েছি।"

নীতিন গডকরি
কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সড়কমন্ত্রী এবং জলসম্পদ মন্ত্রী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সাম্প্রতিক রদবদল প্রসঙ্গে

"আমি নতুন মন্ত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছি। সরকারের দেওয়া কয়েকটি প্রতিশ্রুতি পূরণে তাঁরা কমপক্ষে সাহায্য করতে পারে।"

শারদ যাদব
নেতা, জেডি (ইউ)

মোদী মন্ত্রীসভার নতুন মন্ত্রীদের নিযুক্তি প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী মিথ্যেবাদী, অঙ্ক তবে সত্যি

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সভানেত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস,

দিদি, এতদিনে মোদীকে বাগে আনা গিয়েছে। কালো টাকা, কালো টাকা বলে অনেক চিল্লিয়েছেন তিনি। কিন্তু এত দিনে ঝুলি থেকে কালো বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

কয়েকদিন আগেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পেশ করা রিপোর্ট দেখা গিয়েছে নোটবাতিলের পরে ৯৯ শতাংশ ১০০০ টাকার বাতিল নোটই ফিরে এসেছে দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে। ২০১৬-১৭ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ১৬.৫০ লক্ষ কোটির মধ্যে মাত্র ১৫.৪৪ কোটি টাকার বাতিল নোট ফিরে আসেনি ব্যাঙ্কে। অথচ গোটা দেশের কাছে ৫০ দিন সময় চেয়ে জাল টাকা উদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছিলেন মোদী। তবে কি নরেন্দ্র মোদী মিথ্যে কথা বলছেন! নাকি তিনি কালোর কারবারিদের কাছে সত্যিই হেরে গেলেন!

রিপোর্ট সামনে আসার পরেই বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর দিকেই আঙুল তুলেছেন নোট বাতিলের ব্যর্থতা নিয়ে। তবে এগিয়ে আছেন আপনি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'নোট বাতিল নিয়ে আর বি আই-এর প্রকাশিত তথ্য দুর্নীতির দিকেই ইশারা করছে না কি?'

পাল্টা জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি নোট বাতিলের সমর্থনে বলেছেন, 'নোট বাতিলের ফলে যে টাকা ব্যাঙ্কে এসেছে তা পুরোটাই সাদা হয়ে গেছে ভাবলে ভুল হবে। যাঁরা টাকা জমা দিয়েছেন, তাঁদের আয়ের সঙ্গে জমা টাকার পরিমাণ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। না মিললে আয়কর দপ্তর নোটিশ পাঠাচ্ছে।'

জেটলির আরও দাবি, নোট বাতিলের ফলে দেশে ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে কালো টাকার বিরুদ্ধে তা কাজ করবে

আমার কিন্তু এটাতে ভয় করছে দিদি। মোদী হেরো, মোদী হেরো বলে নাচার আগে একটু ভেবে দেখুন প্লিজ। মোদীকে ঠকাতে যারা টাকা ব্যাঙ্কে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তারা সত্যিই জিততে পারবে? মোদী কি সত্যিই হেরে যাবেন? নাকি, আসলে টাকা জমা দেওয়ার টোপ গিলে কালোর কারবারিরা সবাই মোদীর ফাঁদে!

দেখে নেওয়া যাক কী কী সাফল্য এনে দিল নোট বাতিল—

১। দেশে ১৮ লাখ সন্দেহজনক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খোঁজ মিলেছে।

২। নগদে জমা পড়া ২.৯৮ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে তদন্ত চলছে।

৩। ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩টি সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হয়েছে।

৪। ২৯ হাজার ২১৩ কোটি টাকার অঘোষিত আয় চিহ্নিত হয়েছে।

৫। ১৬ হাজার কোটির কালো টাকা ফিরে আসেনি।

৬। বাজারে থাকা মুদ্রার পরিমাণ ২১ শতাংশ কমেছে।

৭। ৩ লক্ষ সন্দেহজনক ভুয়ো সংস্থার লেনদেন নজরে এসেছে।

৮। ২.১ লক্ষ ভুয়ো সংস্থার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছে।

৯। প্রথমে ৪৫০টি সংস্থা ও পরে আরও ৮০০ অস্তিত্বের খোঁজ না পাওয়া সংস্থা বাতিল করা হয়েছে।

১০। ৪০০টিরও বেশি বেনামি লেনদেনের খোঁজ মিলেছে। লেনদেনের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকারও বেশি।

১১। ব্যঙ্কিং ব্যবস্থায় প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা এসেছে।

১২। ব্যাঙ্কে বেশি অর্থ আসায় ১০০ বেসিক পয়েন্ট সুদ কমানো গিয়েছে।

১৩। ডিজিটাল লেনদেন বেড়েছে ৫৬ শতাংশ। অক্টোবর ২০১৬-তে লেনদেন ছিল ৭১.২৭ কোটির। মে, ২০১৭-তে হয়েছে ১১১.৪৫ কোটি।

১৪। এক কোটিরও বেশি কর্মীকে ইপিএফ এবং ইএসআইসি ব্যবস্থায় আনা গিয়েছে।

১৫। কর্মীদের মজুরি জমা করার জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

১৬। ৫৬ লক্ষ নতুন করদাতা যুক্ত হয়েছে।

১৭। আগের বছরের ৯.৯ শতাংশ থেকে আয়কর রির্টান বেড়ে হয়েছে ২৪.৭ শতাংশ।

১৮। অগ্রিম কর জমা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১.৭৯ শতাংশ বেড়েছে।

১৯। ব্যক্তিগত আয়কর জমা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪.২৫ শতাংশ বেড়েছে।

তালিকাটা বড্ড লম্বা হয়ে গেল। আসলে মোদী ম্যাজিক দেখাতে চাননি। বিদেশে কালো টাকা পাচার তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেশের কালো টাকাও এখন ব্যাঙ্কবন্দি। এখন চলছে খোঁজ। এবার ধরপাকড় শুরু হলো বলে।

তাই দিদি সাবধান! মোদী হেরো, মোদী মিথ্যুক, মোদী কালো এসব বলে নাচানাচি কমান। বিপদ বলে আসে না।

—সুন্দর মৌলিক

তালাকের শিকার মহিলাদের রক্ষার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

গূঢ় পুরুষের কলম

ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ক্ষমতাবানরা মনে করে সবাই তাদের খাসতালুকের প্রজা। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের দিদিমণি সিকিমে সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে বিমল গুরুংকে ধরে আনার নির্দেশ দিতেন না। অন্য রাজ্য থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অনুমতি নেওয়াটা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। আমাদের দিদি এসব মানেন না। সিকিম আমাদের রাজ্যের লাগোয়া ছোট একটি রাজ্য। তবে ছোট রাজ্য বলে তাকে দুর্বল মনে করার কারণ দেখছি না। দেশের সংবিধান পশ্চিমবঙ্গকে যতটা অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছে সিকিমকে তার এক শতাংশ কম দেয়নি। নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কর্তারা বেআইনিভাবে সিকিমে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ করেছিলেন। যেসব আইপিএস অফিসাররা সিকিম অভিযানে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কারণ, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বেআইনি নির্দেশ তাঁরা মানতে বাধ্য নন। তবু তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে মাথা নত করেন। প্রমোশন এবং সামান্য কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভের আশায়। যাইহোক, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। বিষয়টি যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াবে সেকথা আগাম বলে দেওয়া যায়।

চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নারদ ঘুষকাণ্ড সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটে জিতে এসে দিদি ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। একটা চরম দুর্নীতিপরায়ণ দলকে জিতিয়ে এনেছেন রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটদাতারা। তাঁরা ভোট দিয়েছেন সাম্প্রদায়িক স্বার্থে। দিদি বুঝতে পারছেন না যে মুসলমান মহিলারা আর তাঁকে বিশ্বাস করছেন না। সুপ্রিম কোর্ট তাৎক্ষণিক তিন তালাক খারিজ করে দেওয়ার পর রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল নীরব কেন জানতে চান মুসলমান মহিলারা। তিন তালাকে মুখ বন্ধ রেখে তৃণমূল আসলে দেশের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদকেই সমর্থন জানাচ্ছে। উল্টে দিদির মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী প্রকাশ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব বলছেন সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত। তৃণমূলের নয়। আজব কথা। সিদ্দিকুল্লা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হয়েছেন। আর এখন তিনি তৃণমূলের কেউ নন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। তাই সিদ্দিকুল্লার বক্তব্যকে তৃণমূল সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করে না। শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলবাদী পুরুষদের ভোটের লোভেই মুসলমান মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিতে মমতার মনে বাধলো না।

তাৎক্ষণিক তিন তালাককে সংবিধানবিরোধী ঘোষণা করার আরজি নিয়ে যে পাঁচজন মুসলমান মহিলা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন তাঁদের একজন হাওড়া পিলখানার বাসিন্দা ইসরত জাহান। তিনি এখন চরম বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মুসলমান মৌলবাদীরা তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। ইসরতের দুই সন্তান। তাঁর স্বামী ই-মেল পাঠিয়ে ইসরতকে তালাক দেয়। এমনকী তালাকের পরে স্ত্রী সন্তানদের খোরপোষ দিতেও অস্বীকার করে। এমন একটি পুরুষ নিজে তার দুই সন্তানকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে। ইসরত পুলিশকে জানালে ভয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে গোলাবাড়ি থানায় আত্মসমর্পণ করে প্রাক্তন স্বামী মুরতাজা আনসারি। অপহরণ একটি ফৌজদারি অপরাধ। মুরতাজা তার অপরাধ স্বীকারও করে। তারপরেও পুলিশ তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেয়। ইসরতের আইনজীবী নাসিয়া ইলাহি খান বলেছেন, তাঁর মক্কেলকে খুনের হুমকি দেওয়ার পর তাঁরা বহুবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন নিবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁদের আবেদনের জবাব দেওয়ার কথা দিদির মনে হয়নি। কেন? আসলে যেসব মুসলমান মহিলা তালাকের নামে নারী নির্যাতনের শিকার হন তাঁদের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি আমাদের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেই। পুরুষতান্ত্রিক গোঁড়া মুসলমান সমাজে ভোটের বাজারে পুরুষদেরই আধিপত্য বেশি। স্রেফ ভোটের লোভেই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে তিন তালাক প্রথার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন না। সুপ্রিম কোর্টের রায় মানাটা যে বাধ্যতামূলক সে কথাও তিনি মানেন না।

তাই আবার বলছি, ক্ষমতার অহঙ্কার তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছে। মুসলমান মহিলারাই পারেন অন্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে চক্ষুদান করতে।

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণ

১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবন্স শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট গৈরিকবসনধারী স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী সেই শ্রোতৃগণকে ''আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অশ্রুতপূর্ব সম্বোধনে অভিভূত শ্রোতৃগণ কয়েক মিনিট ধরিয়া তুমুল করতালি দ্বারা সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিম্নোক্ত অভ্যর্থনা-সূচক বাক্যে কিছু বলিলেন :

অভ্যর্থনার উত্তর

হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তরদানের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি— ইহাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি- সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কি বলিব— পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি-দূর-দেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন দেশে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ভাব-প্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত-গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীর মত সহ্য করি, তাহা নহে— সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজি 'এক্সক্লুশান' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য) শব্দটি কোনোমতে অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদিগকে বলিতে গর্ববোধ করিতেছি যে, যে বৎসর রোমানদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে আমরাই তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আজও তাহাদিগকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। জরথুষ্ট্রের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয়দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন এবং যাহা আমি অতি বাল্যকাল হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহার একটি শ্লোকের অংশ আজ আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি--- ''রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।'' অর্থাৎ, হে প্রভো, বিভিন্ন পথে গিয়াও যেরূপ সকল নদী একই সমুদ্রে পতিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদেরও তুমিই সেইরূপ একমাত্র গম্য স্থান।

এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমহাসম্মেলন গীতাপ্রচারিত সেই অদ্ভুত সত্যেরই পোষকতা করিতেছে, যাহা বলিতেছে—''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।'' —অর্থাৎ, যে যেরূপ মত আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জগতে ইহারা মহা উপদ্রব উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশায় নিমগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব-সমাজ আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে তদপেক্ষা কতদূর উন্নত হইতে পারিত! কিন্তু আজ ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে, এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইল, উহা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ নির্যাতনপরম্পরার এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসান-বার্তা ঘোষণা করিবে।

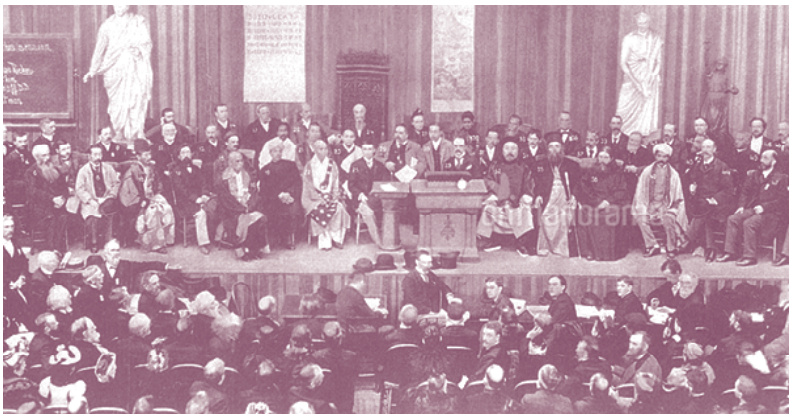

শিকাগো-সম্ভাষণের ১২৫ বর্ষ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

পরাধীন ভারতের এক ত্রিশ বছরের যুবক সামান্য সময়ের বক্তৃতায় শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-তে কী বলেছিলেন, আমাদের জানা। তিনি বলেছিলেন, ভারতের প্রাচীন ধর্ম দর্শন সম্পর্কে। তাঁর কথায় ছিল আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস। তিনি অন্যান্য ধর্মমতগুলির তুলনায় এই আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। এর উৎস ছিল পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আশীর্বাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মহাজাগরণের বৈশিষ্ট্য ছিল সমস্ত ভাবাদর্শ— সাধনা আর অনুশীলন, সমস্ত মত-পথ আর পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেবার লগ্ন। বিশ্বের সমাগত জীবন-জিজ্ঞাসাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা দেওয়া নেওয়ার গরুড়ের ক্ষুধা তখন বাংলার নবজাগৃতিকে সম্ভাবিত করেছিল। ডেভিড কফ এই সময়টিকে ভেবেছেন পাশ্চাত্য বিশেষত ইংরেজদের চিন্তা-প্রণালীর অভিঘাত আর ভারতীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া। একে তিনি বলেছেন 'British impact' বনাম 'Indian response'। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই সংঘাতে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া বলেই সনাক্ত করতে চেয়েছে।

শিকাগো বক্তৃতার শতোত্তর পঞ্চবিংশতি বর্ষে আমাদের বলতে হবে শুধু দ্বন্দ্বঘন প্রতিক্রিয়া নয়— স্বামীজীর বক্তৃতায় ছিল মহাসমন্বয়কে তুলে ধরার একটি অভিনব প্রতিপাদ্য। অন্য সব ধর্ম যেখানে তাদের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে— প্রমাণ করতে ব্যস্ততা দেখিয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছেন সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে। দৃষ্টিকোণটি অভিনব— মৌলিক; তবে, উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে হিন্দ- মহাসাগর গঙ্গা যমুনা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র নর্মদা গোদাবরী যে পবিত্র ভূমি— ভারতবর্ষ, এখানে চিরকাল চর্চিত হয়েছে এই ভাবটি। প্রথম বাক্যগুলিতেই স্বামীজী বললেন, তিনি পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসি- সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। পৃথিবীতে অন্য কোনো ধর্মমতই এমন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়নি। নিজে নিজের শিখা- সূত্র ত্যাগ করে স্বয়ং পিণ্ড প্রদান করে সংসারের মায়াচ্ছেদ করে এই সর্বত্যাগী যাযাবর নিষ্কাঞ্চন নির্লোভ আদর্শনিষ্ঠ মানব-সম্পদের ভাবনা পৃথিবীর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে বেরিয়ে না এলে এই রকম সন্ন্যাসী দল গঠন করা সম্ভব নয়। অন্য ধর্মে সংসারী ধর্মপ্রচারকরা পেশাদার— তাদের 'ভাতা' দরকার হয়। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা ভিতর থেকে এক অভাবিতপূর্ণ আবেগ সঞ্চারি প্রেরণা লাভ করেন— আত্ম-মুক্তি মাত্র নয়, তাদের লক্ষ্য জগতের সেবা— সর্ব জীবের মুক্তি। এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলতে পারেন ভারতবর্ষ সেই পরমকে জেনেছে--- 'সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ' সেই পরম এক। তিনি তাঁর প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষ বিশ্বের সমস্ত ধর্মের ধাত্রী স্বরূপা। কারণটি অত্যন্ত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ইহুদীরা প্রথমে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী পরে ইসলামের অভিঘাতে আক্রান্ত হয়। ভারত তাদের আশ্রয় দেয়। আজও ভারতে বহু স্থানে ইহুদীদের প্রার্থনাগৃহ আছে। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই ইহুদীদের ভালোবেসে আশ্রয় দেয়নি। 'ক্রন্দন প্রাচীর'-কে মনে রেখে তারা বিশ্বব্যাপী অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৯৪৮ নাগাদ নিজভূমিতে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করেছে। বিশ্ব যাদের ধর্মের কারণে অত্যাচার করেছে, ভারত তাদের আতিথ্য দিয়েছে। এখানেই ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য।

স্বামীজী সেদিন বলেছেন, অগ্নিপূজক পারসীকদের জন্যও ভারত দুয়ার বন্ধ করেনি। ইসলামের আবির্ভাবের পর অগ্নিপূজক পারসীকরা ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য করেছে। ভারত তাদের সসম্মান উদার আতিথ্য দিয়েছে। ভারত হয়েছে দাদাভাই-নরৌজি কিংবা জামশেদজী টাটাদের কীর্তি স্থাপনের ক্ষেত্র। শিকাগোযাত্রী স্বামীজীর সঙ্গে জামশেদজী টাটার সাক্ষাৎ হয় জাহাজে। তিনি টাটাকে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। টাটার শহর প্রতিষ্ঠা— শিল্প কারখানা স্থাপনের ইতিহাসে এই অপরূপ সাক্ষাৎকারের ভূমিকা আমরা ভালোভাবে মনে রাখিনি। জুবিলি পার্কে আলো-ধ্বনির অনুষ্ঠান শুনলে নিশ্চয় শ্রোতারা এ ব্যাপারে অবহিত হবেন। এই অপূর্ব সংযোগের আরও বহু ফল ফলেছে। এই নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন লেখা তৈরি করা যায়। জরথুষ্ট্রের ধর্ম তাঁর উৎস ক্ষেত্রে থাকতে পারেনি। ভারতবর্ষ পরধর্ম সহিষ্ণুতার একমাত্র উদাহরণ— তাই এখানে আজও 'নওরোজে'র উৎসবে সেজে ওঠে ভারত।

'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র মহাকাব্য উল্লেখ

করেছিলেন স্বামীজী।

উচ্চারণ করেছিলেন :

যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

(যে-ভাব আশ্রয় করে যেই আসুক না কেন, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জুন, সব মানুষ আমার পথেই চলেছে।) পথ গ্রহণের এই স্বাধীনতা-স্বকীয়তা-রুচি-প্রবণতা-স্থানিক বৈচিত্র্য যাই হোক একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর। ঈশ্বরও তাই সব পথকেই অনুগ্রহ করছেন।

শিকাগো বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ 'শিব মহিম্নস্তোত্র' থেকে আর একটি চমৎকার মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। তাতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিস্তার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য উত্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষণটি ধরা পড়েছে এই শ্লোকে।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃমুকুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।

(অর্থাৎ নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি মিলিয়ে দেয়, তেমনি হে ঈশ্বর, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশত সরল আর কুটিল নানা পথে যারা যাচ্ছে তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।) এই ব্যাখ্যায় ভারতীয় হিন্দু ধর্মের ভাবাদর্শ আর দার্শনিক স্তরের মৌলিকতাটি সুস্পষ্ট। আমরা কোনো কিছুকেই বাতিল করি না। সব কিছুর মধ্যেই পাই পরম এক-এর প্রকাশ ও অনুগ্রহের অপার সম্ভাবনা।

একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে ইসলামের আক্রমণের পর। ওই শিকাগো বক্তৃতাতেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মুসলমানরা আসার পর আমাদের দেশে ভয়াবহ কুফল ফলেছে। 'ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে' আছে; পৃথিবী হয়েছে 'হিংসায় পূর্ণ, বারবার এই মাতা ধরিত্রী 'নর শোণিতে সিক্ত' হচ্ছে। এইসব 'ভীষণ পিশাচগুলি' না থাকলে 'মানব সমাজ' 'অনেক উন্নত' হোত। একথা ঠিক, এখানে স্বামীজী পিশাচগুলিকে যথাযথ নামাঙ্কিত করেননি। হাতে তরবারি আর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে হয় মেনে নাও, না হয় মরো— এই কথা বলে যারা বিশ্ববিজয়ে বেরিয়েছে তাদের কথা না বোঝার কোনো কারণ নেই।

"শিকাগো বক্তৃতাতেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মুসলমানরা আসার পর আমাদের দেশে ভয়াবহ কুফল ফলেছে। 'ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে' আছে; পৃথিবী হয়েছে 'হিংসায় পূর্ণ, বারবার এই মাতা ধরিত্রী 'নর শোণিতে সিক্ত' হচ্ছে। এইসব 'ভীষণ পিশাচগুলি' না থাকলে 'মানব সমাজ' 'অনেক উন্নত' হোত। একথা ঠিক, এখানে স্বামীজী পিশাচগুলিকে যথাযথ নামাঙ্কিত করেননি। হাতে তরবারি আর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে হয় মেনে নাও, না হয় মরো— এই কথা বলে যারা বিশ্ববিজয়ে বেরিয়েছে তাদের কথা না বোঝার কোনো কারণ নেই।"

১৮৯৬-এ লন্ডনের 'সানডে টাইমস'-এর সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় শিকাগো বক্তৃতা-র সাফল্য দাবি করেন— তাঁর ভাষা : 'আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিছুটা কৃতকার্য হয়েছি। ওই সাংবাদিককে অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ধর্ম-পিশাচদের কথা স্পষ্ট করেছেন।

'মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল।'

শুধু কি তাই, তিনি সেই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যুদ্ধ, অসম- সাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি--- এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহ্ন।'

আজ বিশ্ব জুড়ে এই রকম 'প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি' দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বামীজী ১২৫ বছর আগে ঠিকই ভেবেছিলেন। এসবই দুর্বলতা— ওইসব ধর্ম-প্রচারক জানেন না দর্শন-যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক-সদাচার আর ব্যক্তিগত ত্যাগ অনুশীলন ছাড়া যারা শুধু অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায় তাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক শক্তি নিশ্চয় তেমন নেই। আজ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-সম্ভাষণের সূত্রে কিছু মূর্খ অবিশ্বাসী নাস্তিক আর ভোট-শকুনি বলছে তিনি নাকি হিন্দুধর্মের সর্বগ্রহিষ্ণুতার ধারাটি বলেই সেই ধর্ম মহাসম্মেলনে বিজয়ী হয়েছেন। এরা মূর্খ, কুচক্রী, শয়তান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো-সম্ভাষণে ভারতে আশ্রয় পাওয়া যেসব প্রাচীন ধর্মের কথা বলেছেন, তারা কাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল? ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা শুরু করেছে কারা? এ ব্যাপারে স্বামীজীর অভিমতের ভুল ব্যাখ্যা করার কোনো অধিকার কারো নেই। স্বামী বিবেকানন্দের জয় হোক। ভারতের লক্ষ কোটি তরুণ তরুণী তাঁর আদর্শ বুঝে নিয়ে ভারতবর্ষকে ধর্মীয় আক্রমণ অসুহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করলে শিকাগো- সম্ভাষণের শতোত্তর পঞ্চবিংশতিবর্ষ পালন সার্থকতা পাবে।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

স্বামীজী ভারতবর্ষ বলতে কেবল হিন্দুদের ভারতবর্ষ বুঝতেন। মনে করতেন খ্রীস্টান মিশনারি ও নানান সংস্কার সভাগুলির হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা ও হিংসার পরিমাণ এত বেশি যে, সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনোরকম প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন— এরা কেন হিন্দুদের সংস্কার-চেষ্টার বিরোধী হবেন? এরা কেন এইসব আন্দোলনের প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন? বিবেকানন্দের স্বাজাত্যবোধের উৎস ছিল হিন্দুত্ব— ''হিন্দুজাতি সমগ্র জগত জয় করিবে।'' তিনি বলেছেন হিন্দুসমাজে যে সমস্ত বিশেষ দোষ রয়েছে, তা বৌদ্ধধর্মজাত; তার উত্তরাধিকারস্বরূপ এই অবনতি। প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মগ্রহণকে তিনি 'বেশ্যাবৃত্তি'-র সঙ্গে তুলনা করে তিরস্কার করেছেন। হিন্দু সমাজত্যাগী মুসলমানদের স্বামীজী 'দেশের শত্রু' বলে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, কোনো লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তা নয়, একটি করে শত্রু বৃদ্ধি হয়। তিনি বেদান্ত দর্শনকে মহাসত্য বলে মনে করেছেন। ''বেদান্ত— কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হতে পারে, আর কোনো ধর্মই নয়।''

ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ। হিন্দুধর্মের এই জল হাওয়া পছন্দ না হলে তিনি তাকে প্রকারান্তরে দেশ ত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়েছেন— ''এ দেশে সেই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা-কালি পাঁঠা খাবেন আর কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন।'' ১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় খ্রীস্টানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ''তোমরা খ্রীস্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাতে খুবই উৎসাহী; কিন্তু বলো দেখি অনাহার ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেহগুলো বাঁচাবার জন্য কোনো চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ খিদেয় মৃত্যুমুখে পড়ে, কিন্তু তোমরা খ্রীস্টানেরা কিছুই করনি।... ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হলো তাকে অপমান করা।'' তিনি পরিষ্কার করেই বলে দিয়েছেন যদি কোনো সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপাসনায় আপত্তি থাকে, 'তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই'। মনে করেছেন কেবল তখনই কেউ প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য যখন ওই নামটিতে তার ভেতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হবে। যখন যে-কোনো দেশীয়, যে-কোনো ভাষাভাষী হিন্দু নামধারী হলেই পরমাত্মীয় বোধ হবে। যখন হিন্দুনামধারী যে কোনো ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তার হৃদয় স্পর্শ করবে, নিজের সন্তান বিপদে পড়লে যেরকম উদ্বিগ্ন হয় তার কষ্টেও সেরকম উদ্বিগ্ন হবে। তিনি তাই হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ভুলে, চারিদিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করতে বলেছেন।

স্বামীজী বলছেন, ''This world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong.'' রাজযোগ গ্রন্থে বলছেন, 'এই দেহই আমার শ্রেষ্ঠযন্ত্র, শ্রেষ্ঠ সহায়, চিন্তা করিবে— ইহা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়... দুর্বল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। শরীরকে বলো— তুমি বলিষ্ঠ। মনকে বলো— তুমি শক্তিধর এবং নিজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরসা রাখো।' স্বামীজী বলছেন, ''Strength is life ; weakness is death. Strength is felicity, life eternal, immortal ; weakness is constant strain and misery, weakness is death.'' বলছেন, ''গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।'' —''You will understand the Gita better with your biceps, your muscles, a little stronger.'' —বলছেন, ''আমি এমন মানুষ চাই যাদের মাংসপেশী লোহা দিয়ে তৈরি, স্নায়ুগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরি আর এই দেহের মধ্যে এমন মন থাকবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।'' তিনি মনে করতেন দুর্বলতাই পাপ। শুভঙ্করী কাজে শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। জগতের কল্যাণের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য শক্তির প্রয়োগই হচ্ছে ধর্ম। তাই তাড়াতে হবে অলসতা, অকর্মণ্যতা। শরীর মনকে সতেজ রাখতে, জীবনকে গতিময় ছন্দে আনতে খেলাধূলা করতে হবে, শরীরচর্চা করতে হবে। এবং এই কাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই করা দরকার। স্বামীজী মনে করতেন শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। বেদের প্রার্থনায় বলের উপাসনা, সামর্থ্যের উপাসনা, শক্তির উপাসনার কথা পাই— ''তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজি ময়ি ধেহি।'' হে তেজস্বরূপ, আমায় তেজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর, হে বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর, হে ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর।

তিনি ইচ্ছাশক্তির একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রিকরণের কথা বলেছেন। বলছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ ও বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন ঘটাতে হবে। উদাহরণ দিচ্ছেন— 'চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কীরূপে প্রভুত্ব করিতেছে?... এই চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে

প্রয়োগ করিতে পারেন এবং উহার দ্বারাই তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে, তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকের ভাব ভিন্ন ভিন্ন'। ঋগ্বেদ সংহিতা উদ্ধৃত করে বলছেন, 'একচিত্ত হওয়াই সমাজ গঠনের রহস্য। —''সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।'' তোমরা মিলিত হও, বিরোধ করো না। তোমরা সকলে এক অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হও। দেবতারা একমনা হয়েই যজ্ঞভাগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেবতারা একচিত্ত বলেই মানুষের উপাসনার যোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ, গুরুগোবিন্দ সিংহের মতবাদের জায়গা হিন্দুধর্মে আছে বলে মনে করতেন। ১৮৯৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসভার ষোড়শতম দিনের অধিবেশনে তিনি বললেন, ''Hinduism cannot live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism...the Buddhists cannot stand without the brain and philosophy of the Brahmins, nor the Brahmin without the heart of the Buddhist. This separation between the Buddhists and the Brahmins is the cause of the downfall of India.'' বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারে না। হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মও বাঁচতে পারে না। ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনের সাহায্য না নিয়ে বৌদ্ধরা দাঁড়াতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। তিনি তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ''Let us then join the wonderful intellect of the Brahmin with the heart, the noble soul, the wonderful humanising power of the Great Master.'' তাই তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশে উদ্যত হয়েছিলেন ব্রাহ্মণের অভিনব ধীশক্তির সঙ্গে লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা ও অসাধারণ লোককল্যাণশক্তি যোগ করতে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্মের সঙ্গে একই ছায়ার নীচে আনতে চেয়েছিলেন। 'প্রবুদ্ধ' কথাটির মধ্যে রয়েছেন হিন্দুদের দশাবতারের অন্যতম শেষ অবতার বুদ্ধ (প্র+বুদ্ধ=প্রবুদ্ধ)। তিনি মনে করতেন গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে ভারত জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন ঘটবে। ''I repeat, Shakya Muni came not to destroy, but he was the fulfilment, the logical conclusion, the logical development of the religion of the Hindus.'' হিন্দুদের মনে কোনো আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি—

''আবার প্রবুদ্ধ হও !
এ নিদ্রা, মৃত্যুতে নয়, জীবনেই ফিরাতে আবার,
এ শুধু বিশ্রাম, যাতে চোখে ভাসে নতুন স্বপ্নের
অদম্য সাহস। দেখো, হে সত্য, পৃথিবী চায় তোমাকেই,
তুমি মৃত্যুহীন।''

স্বামীজী উপনিষদের ঋষির মতো আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা অমৃতের অধিকারী। —'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।' হে অমৃতের পুত্রেরা, শোন—আমি এই অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার রাস্তা পেয়েছি। আমি সেই প্রাচীন মহান পুরুষকে জেনেছি, যিনি সকল আঁধারের ওপারে, মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। এই প্রাচীন বাণী শুনিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন হিন্দুধর্মে আমাদের পাপী বলতে চাওয়া হয় না। আমরা পবিত্র ঈশ্বরের সন্তান, আমরা মর্ত্যভূমির দেবতা। মানুষকে পাপী বলার মতো মহাপাপ আর নেই। এ যে মনুষ্যত্বের স্বরূপের ওপর একটা মিথ্যের কলঙ্ক আরোপের প্রচেষ্টা। স্বামীজী এই ভুল বদলে দিতে চেয়েছেন। আমাদের মেষ বলে মনে করতে মানা করেছেন, বলেছেন সিংহের মতো হয়ে যেতে। —''Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep ; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal.''

স্বামীজী রাষ্ট্রের আত্মার কথা বলেছেন। বলেছেন এই আত্মাতে যতদিন না ঘা পড়ে, ততদিন সেই রাষ্ট্রের মৃত্যু নেই। স্বামীজী উদাহরণ দিচেছন, রাষ্ট্রের আত্মা বা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়ত্ব যেন সাপের মাথার মণি, যেন রূপকথার জগতে রাক্ষসীর প্রাণভোমরা। যতক্ষণ রূপকথার সাপের মাথায় মণি থাকবে ততক্ষণ তাকে মারা যাবে না। যতক্ষণ রাক্ষসীর প্রাণভোমরারূপ ক্ষুদ্র পাখির ভিতর তার প্রাণ ততক্ষণ তাকে মারা যাবে না। সাপ বা রাক্ষসীকে মারতে হলে মাথার মণি সরাতে হবে, সেই প্রাণপাখিকে টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে। স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় সৌধ, ভারত রাষ্ট্রের যে মেরুদণ্ড তার আত্মা রয়েছে ধর্মে। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন নিহিত আছে হিন্দুধর্মে। তিনি ভারত রাষ্ট্রের মন ও প্রাণপ্রবাহের স্বরূপ চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন ধর্ম অনুসরণ করলেই দেশ গৌরবান্বিত হবে। ধর্ম পরিত্যাগ করলে রাষ্ট্রীয় মৃত্যু অনিবার্য। বৈদেশিক আগ্রাসনকারীর অত্যাচারে মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস হয়েছে, নেমে এসেছে নানাবিধ আক্রমণ, ধ্বংসলীলা। কিন্তু অত্যাচারের স্রোত সামান্য বন্ধ হওয়ামাত্র পুনরায় উঁকি মেরেছে মন্দিরের চূড়া, স্পষ্টতর হয়েছে পুনরাভ্যুত্থানের চিহ্ন। ধ্বংসাবশেষ থেকে উত্থিত হয়েছে নতুন জীবন, সে জীবন অটল-অচল ভাবে বিরাজ করেছে আগের মতোই। রাক্ষসীর প্রাণপাখির মতো ভারতবর্ষের ধর্মরূপ প্রাণপাখিকে বিনাশ করা যায়নি বলেই এত সয়ে এ জাতটা বেঁচে গেল। হাজার হাজার বছরের স্বভাব— তা মরবেই বা কী করে? স্বামীজী ভারতবর্ষের এই জাতীয় চরিত্র বদলের কথা বলেননি। তাঁর মতে যে নদী পাহাড় থেকে হাজার ক্রোশ নেমে আসে তাকে ফের পাহাড়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বলছেন, যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়। বলছেন, যে দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম সে দেশকে ধর্মের মধ্য দিয়েই সব করতে হবে। —'রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে

হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার...।' ভারতবর্ষের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়ে ছাড়া কাজ করবার যে অন্য উপায় নেই তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বামীজী জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সতর্ক করে তিনি বলেছেন ধর্ম ছেড়ে জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হলে ভারতবর্ষের সুবিশাল রাষ্ট্রীয় সৌধ তিনপুরুষ যেতে না যেতেই বিনষ্ট হবে, হিন্দুর মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর পরামর্শ হলো, যে অমূল্য ধর্মসম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি তা প্রাণপণে ধরে রাখতে হবে। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। বলেছেন, 'তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে'। তিনি এক হাতে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরে অন্য হাত প্রসারিত করতে বলেছেন শেখবার জন্য, বলেছেন সেই শিক্ষণীয় বিষয় যেন হিন্দুজীবনের মূল আদর্শের অনুগত হয়। 'What we want are western science coupled with Vedanta and Brahmacharya as the guiding motto.' এটিই হচ্ছে নতুন যুগের বিশ্বায়নের মূলমন্ত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়, যার মূলে থাকবে ব্রহ্মচর্য।

স্বামীজী বলেছেন, 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। —'Knowledge is inherent in man ; no knowledge comes from outside ; it is all inside.' ঋষি অরবিন্দও মনে করতেন, কিছুই শেখানো যায় না এটাই হবে শিক্ষার প্রথম তত্ত্ব। শিক্ষক নির্দেশদাতা বা শাসনকর্তা নন, তিনি সহায়ক ও পথ প্রদর্শক। স্বামীজী শিক্ষা ও ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখাননি। ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার ভেতরকার সার জিনিস। শিক্ষার লক্ষ্য মানুষ গড়া, ধর্মের লক্ষ্যও তাই। ধর্ম ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক, বিকাশ ধারার দুই পথ। উভয়ের উদ্দেশ্যই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ। —'Religion is the idea which is raising the brute unto man and man unto God.' স্বামীজীর শিক্ষাভাবনায় ধর্মের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। তিনি বলেছেন, 'যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতরত হয় এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম।... ধর্মের যাহা সার্বজনীন সাধারণ ভাব তাহা শিখাইবে।' দেশের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে শিক্ষার ভাবসামঞ্জস্য থাকার কথা বলেছেন। শিক্ষা যেন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়। স্বামীজী পূর্বের মতো ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, ব্রহ্মচর্যকে শিক্ষার বিশেষ সহায়ক বলে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্মচর্য একাগ্রতার সহায়ক ও অসীম শক্তিদায়ক যা বিদ্যার্থীর বিদ্যা অর্জনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এতে আত্মসংযমের অনুশীলন হয়, প্রবল সক্রিয়তা আর ইচ্ছাশক্তি জাগরূক হয়।

তিনি মনে করেছেন, ছাত্রজীবন ভোগের জীবন নয়, প্রস্তুতির জীবন। সৎকর্ম, সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সদাভ্যাসে মনের শুচিতা রক্ষিত হয়। প্রায় একই উক্তি রবীন্দ্রনাথেরও, 'জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নব্যোগমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।' স্বামীজী বলছেন, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়— শ্রুতিধর স্মৃতিধর হয়। —'Do you see, simply by the observance of strict brahmacharya (continence), all learning can be mastered in a very short time– one has an unfailing memory of what one hears or knows but once.' স্বামীজীর 'গুরুগৃহবাসম' আর রবীন্দ্রনাথের 'তপোবনের কেন্দ্রস্থলে' গুরু-র মধ্যে যে তফাৎ তা হলো--- বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সন্ন্যাসীর দ্বারা পরিচালিত আশ্রম আর রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গৃহী-গুরু। তবে বিদ্যা আদান প্রদানের পরিবেশটুকু দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রায় এক।

স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে যা খুব বেশি করে পাই তা হলো শূদ্র- জাগরণের কথা। তাঁর 'স্বদেশ মন্ত্র' সেই বার্তায় আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ— যা শ্রোতার অন্তরকেই শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। —'ভুলিও না— নিচ জাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।' তিনি আশা প্রকাশ করেছেন নতুন ভারত বেরোবে লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। নতুন ভারত বেরোবে মুদির দোকান থেকে, ভুট্টাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। এরা হাজার হাজার বছরের অত্যাচার নীরবে সয়েছে, সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, কিন্তু পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, অটল জীবনীশক্তি। যারা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়াটা উল্টে দিতে পারে, তারা আধখানা রুটি ত্রৈলোক্যকে তেজে ভরিয়ে দেবে। তাই উদাত্ত কণ্ঠে স্বামীজীর আহ্বান, ''হে বীর! সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো--- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'' বলেছেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা। উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ''আত্মনোমোক্ষার্থাং জগদ্ধিতায়চ।''

তথ্যপঞ্জী :

১. বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, ১৯৯৩ (২১তম মুদ্রণ), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা। ২. স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা, ২০১২ (চতুর্থ সংস্করণ), বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা। ৩. উত্তিষ্ঠ, চতুশ্চত্বারিংশত্তম সংখ্যা, ২০১০-২০১২, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক), রহড়া। ৪. Vivekananda : His call to the Nation, 1997 (Sixteenth Impression), Advaita Ashrama, Calcutta. ৫. শুভমনকথা, মুখ্যভাবনা : সার্ধশত জন্মবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ৭ (৪), ২০১২।

(লেখক কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অব রিসার্চ)

গদি বাঁচাতে নপুংসকতার পাঠ : অহিংসাই হিন্দুত্ব

রাম ও কৃষ্ণ তবে কে দিদি?

প্রীতীশ তালুকদার

ধর্মশিক্ষা : মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট বলেছে হিন্দুধর্ম কোনো ধর্ম নয়, এক জীবনধারা। ধর্মের সংজ্ঞা কী, বা জীবনধারা ধর্ম নয় কেন, তা অবশ্য বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট আরো যেটা বলেনি সেটা হলো— হিন্দুত্ব কী এবং হিন্দু ধর্মের মানুষের স্বভাব, মানসিক ও ব্যবহারিক গঠন ও আচরণ কেমন হওয়া উচিত। তবে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা সেই মহৎ কাজটি করেছেন : প্রেম, অহিংসা, সহনশীলতাই হিন্দু ধর্ম; এর অন্যথা যারা করে তারা হিন্দু নয়, হিন্দুর কলঙ্ক। কে মমতা ব্যানার্জী? সাধু-সন্ত? সনাতন হিন্দু ধর্মের মনীষী? ধর্মবিদ? একেবারেই না, রাজনীতির কারবারি। তাছাড়া কাল পর্যন্ত হিন্দু ও হিন্দুত্ব যাঁর কাছে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা ও বর্জনীয় ছিল তাঁর মুখে হিন্দু-হিন্দুত্বের উপদেশ ধর্মের জন্য নয়, রাজনীতির স্বার্থে তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই গৌড়-বঙ্গের অনেক হিন্দু-সন্তানের তেমনটাই বিশ্বাস। তাছাড়া রাজ্যে যখন সিংহভাগই হিন্দু তখন হিন্দুর সমর্থনেই মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী, অনেক হিন্দুর কাছেই তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছু। তাই আলোচনাটা জরুরি।

দিদির অহিংসা : 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' দর্শন; নিজেকে যেভাবে দেখি, যতটা ভালোবাসি, জগতের সকল বস্তুকে ও প্রাণীকে সেভাবে দেখা ও ভালোবাসা, কারো কোনো ক্ষতি, আঘাত, হত্যা না করাই অহিংসা। খুব ভালো পথ, কিন্তু আমার শরীরের অভ্যন্তরে বাঁসা বাঁধা কৃমিকীট ও জীবাণু, রোগজীবাণু ছড়ানো মশা-মাছি, ফসলের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তুকে হিংসা করতে আমরা বাধ্য। তাও তো হিংসা। তাহলে? জানি, মমতা দিদির অহিংসা বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম' নয়, তিনি 'গোরু কাটো খাও'-এর ঘোর সমর্থকও। মানুষ নামধারী ভোটারদের নিয়েই তাঁর যত চিন্তা, তাতে হিন্দুদের জন্য তাঁর অহিংসা শিক্ষা হলো— কেউ এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও; খবরদার অস্ত্র ধরবে না, পাল্টা আঘাত করবে না। নিপাট গান্ধীগিরি।

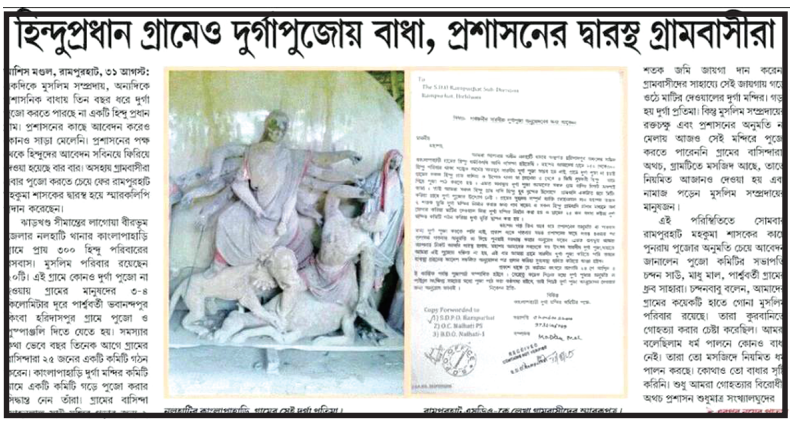
হিন্দুপ্রধান গ্রামেও দুর্গাপুজোয় বাধা, প্রশাসনের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

এরা কারা? : হে বালক রাম, ওই দেখ তারকা; ওকে এক্ষুনি বধ করো। ঋষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশ। রামচন্দ্র তাই করলেন। কৃষ্ণও তাই। তিনিও সন্দিপনী মুনির কাছে অস্ত্রশিক্ষা করলেন। তার আগে শৈশবেই পুতনাকে দিয়ে হত্যালীলা শুরু, তারপর কত যুদ্ধ আর কত হত্যা তার ইয়ত্তা নেই। হিন্দুর পরম আরাধ্য দেবী দুর্গার দশ হাতে দশ অস্ত্র, পদতলে দেবীকর্তৃক শূলবিদ্ধ অসুর। স্বামী বিবেকানন্দ এক সাহেবের কলার চেপে ধরে আরক্ত নয়নে মুষ্ঠি বাগিয়ে বলেছিলেন— আর একটা কথা বললেই তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব। স্বামী প্রণবানন্দ তো হিন্দুদের সংগঠিত হবার, শরীর গড়ার ও অস্ত্রশিক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। মঙ্গল পাণ্ডে থেকে সুভাসচন্দ্র বোস, এরা সকলেই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে মরণ খেলায় মেতেছিলেন। অহিংসাই হিন্দুত্ব হলে এরা কারা দিদিমণি?

অহিংসা ও বাস্তবতা : 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।'— 'এই জগতে দেব-স্বভাব ও অসুর-স্বভাব— এই দুই প্রকার মানুষই আছে।' অহিংসা আমার ধর্ম হলেও তা তোমার ধর্ম নাও হতে পারে। পৃথিবী জুড়ে যে সন্ত্রাসবাদীরা মারণাস্ত্র হাতে সাধারণ মানুষের জীবন, সম্পদ, সভ্যতার শত্রু হয়ে গুণ্ডামি, লুঠ, হত্যা, ধর্ষণ চালাচ্ছে, যারা হিংস্রতা আর নৃসংসতার ধর্মে বিশ্বাসী, যাদের ধ্বংস না করলে সাধারণ সুস্থ সভ্য সমাজকে রক্ষা সম্ভব নয়, তাদের বিনাশ করে পৃথিবীকে ভয়মুক্ত তো করতেই হবে। এই পৃথিবীতে নানা মত নানা পথের উদ্ভব হয়েছে, সকলেই অহিংসা ও শান্তির ধর্মে বিশ্বাসী তা নয়। পৃথিবীতে বহু ধর্মমতেরই বিস্তার হয়েছে তলোয়ারের ডগায়, অসংখ্য অসহায় নিরীহ নর-নারীকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে; এখনও সেই ধারা বর্তমান। এটাই কঠিন বাস্তব। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা হোক বা সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা, কোনোটাই

কোনোদিন শক্তি আর অস্ত্রের শাসন ছাড়া সম্ভব হয়নি, এখনও হয় না। অহিংসক গান্ধীজী অহিংসা ও প্রেম দ্বারা ধর্মোন্মাদ মুসলমান মোপলাদের হিংস্রতা থেকে মালাবারের হিন্দু নারী-পুরুষকে রক্ষা করতে পারেনি, কলকাতা ও নোয়াখালির নরসংহার বন্ধ করতে পারেনি, দেশভাগে বিপন্ন লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীকেও রক্ষা করতে পারেনি। এই অহিংসা এমন কিছু যা বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে সম্পূর্ণ অবাস্তব।

সনাতন হিন্দু ধর্ম : হিন্দুর ধর্ম কি তার অনুগামীদের বিপন্ন ও বিলুপ্ত করার জন্য? না। মহাভারতেরই কর্ণপর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'যার দ্বারা প্রজার ধারণ হয় তাই ধর্ম'। ব্যক্তিগত জীবন হতে সর্বচ্চোক্ষেত্র পর্যন্ত ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠ পথই হিন্দুধর্ম। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃসংসতা, সংযম ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গুণগুলোকে হিন্দু দর্শনের সর্বত্র ধর্মপথ বলা হয়েছে, তবে তা নিঃশর্ত নয়। সে অহিংসা হলো আমি লোভ, ঈর্ষা, জিঘাংসা, মত্ততার বশবর্তী হয়ে কাউকে দৈহিক বা মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত করব না, কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করব না, কারো জীবন-সংশয় ঘটাব না। তবে কেউ আমার ধনসম্পদ কেড়ে নিতে এলে, আমার বিশ্বাসকে লাঞ্ছিত করলে বা স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইলে, আমার দেশ ও ধর্মে আঘাত করলে, কোনো নারীকে বলাৎকার করতে উদ্যত হলে তা সহ্য করা অহিংসা বা ধর্ম নয়, তার প্রতিরোধ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ধর্ম।

মহাভারতের মহাবিনাশকারী মহাযুদ্ধকে স্বয়ং ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ধর্মযুদ্ধ বলেছেন। যুদ্ধটা পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে। পাণ্ডবগণ ধর্মস্বরূপ আর কৌরবগণ অধর্মস্বরূপ। কেন? কৌরবরা ষড়যন্ত্রকারী, ঠগ, কপট, শক্তিমত্ত, অত্যাচারী, শোষক, নারীনির্যাতক-রূপ অন্যায়ের পথিক তাই অধর্ম, আর পাণ্ডবরা ন্যায়পরায়ণ, সহিষ্ণু, সমদর্শী-রূপ ন্যায়ের পথিক তাই ধর্ম। অধর্মের বিনাশ দ্বারাই ধর্মের স্থাপন সম্ভব (বিনাশায়চ দুষ্কৃতম্)। অন্যায় ও অত্যাচারের বিনাশ করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সেটা ধর্মযুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সত্য ও ন্যায়ই সনাতন হিন্দু ধর্ম। এটাই ধর্ম, এটাই শৃঙ্খলা, এটাই সৌভ্রাতৃত্ব, প্রেম ও বিশ্বশান্তির পথ। তাই আধুনিক যুগের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আধুনিক বিচারালয়ও ন্যায়ালয়, ধর্মাধিকরণ। বেদ-পুরাণ পড়ুক বা না পড়ুক, রামায়ণ-মহাভারত ও তার দুই নায়ক শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও কর্ম এদেশে সকলেরই জানা। তাই কাণ্ডজ্ঞান যুক্ত কোনো মানুষ কখনই বলবে না যে, অহিংসাই হিন্দুধর্ম, অন্যথা যে করে সে হিন্দু নয়, হিন্দুর কলঙ্ক। তাহলে দিদি এমন বললেন কেন?

ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাই নিজস্ব স্থায়ী ভোটব্যাঙ্ক এবং দুর্বল প্রতিপক্ষ। ভারতের মতো বহু-ধর্মীয় রাষ্ট্রে ধর্ম, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের তোষণ করে ভোটব্যাঙ্ক বানানোর সহজ পন্থা গৃহীত হয়ে আছে। সেই সহজ রাস্তা ধরে মুসলমানি সেজে, মোল্লা-মৌলানাদের দরজায় হত্যে দিয়ে, হিন্দু বনাম মুসলমান আবেগে রিজুয়ানুরের ঘাড়ে চেপে ক্ষমতায় আসা গেছে। মুসলমান তোষামোদ, দান-খয়রাতের সঙ্গে হিন্দু নির্যাতন, মন্দির ও প্রতিমা ভাঙা, হিন্দুর উৎসব-অনুষ্ঠানে হামলা, হিন্দু গ্রামে হামলা করে লুঠপাট, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এবং কাদরি, বরকাতি, সিদ্দিকিদের ফতোয়াবাজিকে প্রশ্রয় দিয়ে বেশ চলছিল। দিদির ভালো ছেলেদের অহিংস ধোলাইয়ের চোটে বামপন্থী, কংগ্রেস সব গর্তে ঢুকে গেছে। তবুও বিপদ এসেই গেল। হিন্দুদের মনে অপমান, লাঞ্ছনা, অসহায়তার অসন্তোষটা যে ধিকি-ধিকি জ্বলে উঠছিল তাকে আমল না দিলেও চলত, কিন্তু তারা এবার গেরুয়া পতাকার নিচে জড়ো হয়ে বাংলা জুড়ে ঝড় তুলেছে। বাপ্‌রে! রাজ্য জুড়ে গেরুয়া দলের শত-শত রামনবমীর মিছিলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী-পুরুষ! কপালে তিলক, মাথায় ফেট্টি, হাতে তলোয়ার! অবোলা কাপুরুষ হিন্দুর বোল ফুটছে, বীরভাব জাগছে। সত্তর শতাংশ হিন্দু বিপক্ষে গেলে ত্রিশ শতাংশ মুসলমান ভোট কোন কাজে আসবে? তাই বেদ-উপনিষদ নয়, রামায়ণ- মহাভারত নয়, হিন্দু ধর্মনেতা সাধুসন্ত নয়, নাকাব পরে নামাজ পড়া রাজনীতির কারবারি মমতা ব্যানার্জীর সং সেজে স্বদলবলে হিন্দুত্বের পাঠ দিচ্ছেন, এমনকি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও। ভেদনীতি আর মিথ্যা ধর্মশিক্ষার ফের মুষিক (ইদুর) বানানোর ব্রত।

সিদ্ধান্ত : ইতিহাস সাক্ষী, হিন্দু কখনও তলোয়ার হাতে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে কোনো দেশ, কোনো জাতির উপর ঝাপিয়ে পড়েনি, কিন্তু তার শিকার হয়েছে। দেশটাও খণ্ডিত হয়েছে, তবু এই খণ্ডিত ভারতেও হিন্দু নিজের মতো শান্তিতে থাকার ও বাঁচার অধিকারটুকু এখনও পায়নি। খোদ কলকাতার বুকে মন্দিরে গো-মাংস নিক্ষেপ, কালনাতেও। ময়ূরেশ্বরে মহরমের চাঁদার জুলুমে হিন্দু যুবক খুন। ডায়মণ্ডহারবার, হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জ, কাটোয়া, পূর্বস্থলীতে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর। ধুলাগড়, মন্তেশ্বর, চাঁচল, রানিবাঁধ, বুদবুদ, মিনাখা, কালিয়াচক, উত্তর দিনাজপুরের চোপরা, মন্দিরবাজার, এমন অসংখ্য স্থানে হিন্দু গ্রামে হামলা, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ। রাজ্যের সত্তর শতাংশ হিন্দুর যদি এই দশা হয় তবে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধিকারী মুসলমানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলে কী হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। সময় থাকতে সাধু সাবধান। জাগ্রত সংগঠিত সমাজ শক্তিশালী। শক্তিশালীরাই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, শান্তিতে থাকতে পারে। কিছু সংখ্যক হিন্দুর জাগরণেই আজ নিজেকে হিন্দু প্রমাণে পিসি, ভাইপো পাল্লা দিয়ে নিজেদের খাঁটি হিন্দু ঘোষণা করছেন, মন্দিরে ছুটছেন। ভোট বড় বালাই। আজ এই মুহূর্তে রাম ও কৃষ্ণের পথকেই অনুসরণ করা উচিত বাংলার হিন্দুদের। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের জাতীয়তা

স্বামীজী আমেরিকাতে যাওয়ার আগে সারা ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন। বুঝেছিলেন, এই পরানুবাদ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা আর এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতাকে সম্বল করে একটা জাতি উচ্চাধিকার লাভ করতে পারবে না। জাতিটাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে একেবারে নিজের ভেতরকার গর্ব করার মতো কিছু সামনে আনতে হবে। এমন কিছু সম্পদ যা কেবল ভারতের নিজস্ব। যার বলে ভারত বলতে পারে, পৃথিবীকে সে এমন কিছু দিতে পারে যা অন্য কারোর নেই। সারা দেশ ঘুরে ভারতের শেষ সীমা কন্যাকুমারীতে পৌঁছে স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের সেই অনন্য ধন হলো হিন্দুত্ব। সহস্র সহস্র বছরের সাধনার ধন, যা পৃথিবীকে বাঁচতে শেখাবে। এই যে বহু উপাসনা পদ্ধতি, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির মানবসমাজ তার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথই হলো হিন্দুত্ব। হিন্দুত্ব কোনো উপাসনা পদ্ধতি নয়। এক জীবনধারা। যা কেবল অপার সহিষ্ণুতাই নয়— যাতে আছে অপরকে আপন করার অসীম ক্ষমতা।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, এই হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের জাতিগত উত্তরাধিকার। ভগিনী নিবেদিতা 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজমের' উপর লিখেছেন সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতারা বুঝেছিলেন যে হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের চালিকা শক্তি। হিন্দুত্ব ভারতবর্ষকে অজেয় শক্তি দিয়েছে। ভারতবর্ষে এক হাজার বছরের আরব সাম্রাজ্যবাদ আর দুশো বছরের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পরেও প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। জাতিভেদের মতো কর্কটরোগ শরীরে নিয়েও দু-দুটি ভয়ানক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়ে জিতে গেছে ভারতবর্ষ আর এই জেতার সঞ্জীবনী মন্ত্র হলো হিন্দুত্ব। স্বামীজী বলতেন ভারতবাসীর মূল হল ধর্ম। এরা কোনো কিছুর বিনিময়েই সত্যকে, ধর্মকে ছাড়েনি। ভারতবাসীর ধর্ম, এই হিন্দুধর্মকে বিশ্বধর্মমহাসভায় বলা প্রয়োজন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছ থেকে এমন আদেশই পেলেন স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীর ওই শিলাখণ্ডে বসে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরেই ঠিক করলেন আমেরিকা যাবেন। তার পরে দেশে-বিদেশে অনেক অপেক্ষা, সংগ্রামের পরে পৌঁছেছিলেন শিকাগোর কলম্বাস হলের পোডিয়ামে। একজন পরাধীন দেশের, ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীর সেই জয়ের কাহিনি এখনো যুবমনকে সমানভাবে আলোড়িত করে।

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা ভারতকে কী দিয়েছিল? সর্বপ্রথম ভারতবাসীর মনে এক প্রত্যয় জাগিয়েছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর আগেই ভারতের নবজাগরণের দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল ঠিকই, তবে সেযুগের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরাও ভাবতে পারতেন না যে ভারতের দেবার মতো কিছু আছে। ভারত কেবল পশ্চিমের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যাবার জন্য টিকে নেই, বরং ঈশ্বরের ভারতবর্ষকে এত কঠিন অবস্থার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে। ভারত বেঁচে আছে বলেই, মানবসভ্যতা বেঁচে থাকবে। বিবেকানন্দ উন্নত বিশ্বের সর্বোন্নত দেশের সর্বোচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বললেন, তোমরা যখন জঙ্গলের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তখন আমরা সভ্যতার পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। এই এগিয়ে যাওয়াটা কোন পথে? সেটা বৈদিক মুনিঋষিদের পথ আর কণাদ, ভাস্কর, আর্যভট্টের, শুশ্রুতের মতো বৈজ্ঞানিক তপস্বীদের পথ। এই সব ভাবনার মধ্যে এক জীবনবোধ আছে। তা হলো ধর্ম। তাই স্বামীজী বিশ্বধর্ম মহাসভায় সোজাসাপটা হিন্দুধর্ম হিন্দুত্বের কথাই বলেছিলেন।

‘মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক’

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এই বছরটি স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষ। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমদিন স্বামীজী বলেছিলেন— ‘পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।’ শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীজী যোগদান করেছিলেন। এবং এই হিন্দুধর্মকেই ‘সর্বধর্মের প্রসূতি স্বরূপ’ বলে তুলে ধরেছিলেন শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে। হিন্দু ধর্মকেই সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ বর্ণনা করেছিলেন কেন স্বামীজী? সে কি নিছক হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বলে, নাকি তার অন্য কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ছিল। স্বামীজীর এই বক্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে প্রথমে বুঝতে হবে ‘ধর্ম’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী। সেক্ষেত্রে আমাদের Religion এবং Dharma —এই দুটি শব্দের মূলগত পার্থক্য বোঝা দরকার। অক্সফোর্ড অভিধানের ব্যাখ্যা অনুসারে Religion হলো— ‘Particular System of faith and worship.’ অর্থাৎ বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি। কিন্তু Dharma শব্দটির অভিধানগত অর্থ অনেক ব্যাপক। Dharma হলো— ‘The eternal law of universe.’ অর্থাৎ চিরকালের সর্বজনীন একটি জীবনদর্শন বা জীবনধারা। যাকে বলা চলে way of life। এর সঙ্গে নিছক ধর্মাচরণের কোনো সম্পর্ক নেই। স্বামীজী হিন্দু

ধর্মকে এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে ‘সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ’ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন— ‘হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য স্বরূপ দেবত্ব বিকশিত করে। এবং সেই এক চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন— আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই পরস্পরের বিরুদ্ধভাব ধারণ করে।’ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬)

স্বামীজী আরও বললেন, ‘বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন।’ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫)। আমাদের দেশের সেকুলার পন্থী এবং বামপন্থীরা হিন্দুত্বের এই উদার এবং ব্যাপক ধারণাটিকেই বুঝতে অপারগ। হিন্দুত্বকে নিছক একটি উপাসনা পদ্ধতি হিসেবে তুলে ধরে তার সম্বন্ধে একটি সংকীর্ণ ধারণা প্রচার করতেই তারা উদ্যোগী। সেকুলার পন্থী এবং বামপন্থীদের প্রচারে ‘হিন্দুত্ব’ আসলে একটি উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণা— যা ‘বিদেশ থেকে আগত’ আর্যরা ভারতে আমদানি করেন। এরকম একটি অপব্যাখ্যার মূল কারণ, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসকে যথাযথ অন্বেষণ না করা। স্বামীজীও তাঁর সমসময়ে এইরকম বিকৃত ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন— ‘ওই যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরেকেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন— ওসব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ। আবার ওইসব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।’ (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৯)।

সেকুলার এবং বামপন্থীরা এই যে আর্য আগ্রাসনের একটি কাল্পনিক তত্ত্ব শোনান, তারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এই পর্বটির প্রতি আলোকপাত করেন না যে, আর্যরা আদপেই বহিরাগত কোনো জাতিগোষ্ঠী নয়। সিন্ধুনদের পূর্ববর্তী ভূখণ্ডবাসী এক সুসভ্য জাতি, যাদের সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা— তারাই আর্য জাতি। এই জাতি একটি উচ্চমানের সংস্কৃতির ধারক। সিন্ধুনদের ভূখণ্ডবাসী এই জাতিই ‘হিন্দু।’ হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় নয়। এদের ধর্ম-সংস্কৃতিই হচ্ছে ‘হিন্দুত্ব।’ এক কথায় বলতে গেলে হিন্দু জাতি গোষ্ঠী হচ্ছে নানা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক জনমণ্ডলী— যারা সংস্কৃতিগতভাবে এক। কাজেই ধর্মাচরণে কেউ শিখ হতে পারেন, কেউ জৈন, কেউ বৌদ্ধ, এমনকী খ্রিস্টান, মুসলমানও হতে পারেন— কিন্তু ভারতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক

পরিচয়ের প্রশ্ন এলে— এরা সকলেই হিন্দু। যে কারণে ভূতপূর্ব কংগ্রেসি শিক্ষামন্ত্রী এন সি চাগলা বলেছিলেন— 'ধর্মাচরণে আমি একজন মুসলমান; কিন্তু সংস্কৃতিগত ভাবে আমি একজন হিন্দু।'

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আর্য আগ্রাসনের এই মনগড়া তত্ত্বে স্বামীজীও বিশ্বাস করতেন না। স্বামীজী বলেছেন— 'ইউরোপীয়রা যে দেশ বাগে পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যরাও তাই করেছে!!! ওরা হা-ঘরে, 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' করে কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়— আর্যরাও তাই করেছে! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়— আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখ গে।... রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণা বুনো বিজয়! বটে— রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হলো কোথায়? তারা সব রামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন গুহকের, কোন বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন। তা বলো না? ...অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতলক্ষেত্র— আর্য সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ— এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন— প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ।' (বাণী ও রচনা— ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১০)

হিন্দু এবং হিন্দুত্বকে নিয়ে সেকুলারপন্থীরা যে অবাঞ্ছিত বিতর্ক সৃষ্টি করেন এবং হিন্দু ধর্মকে খাটো করার চেষ্টা করেন, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে তার পশ্চাতে রয়েছে একটি অসৎ উদ্দেশ্য। সেকুলারপন্থার নামে আসলে তারা যা করেন, তা হলো হিন্দু ভাবনাকে আক্রমণ এবং অনাবশ্যক হিন্দু বিরোধিতা। অথচ সব মতের প্রতি সমান শ্রদ্ধার ভাব কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে হিন্দুত্বের ভাবনাতেই। ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা কিন্তু নিজ মত ব্যতীত অন্য কোনো মতকে শ্রদ্ধা প্রদান করতে চাননি। ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুত্বের ভাবনার এই মূলগত পার্থক্যটিও স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। স্বামীজী বললেন— 'জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানরাই প্রথম পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।' (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭)

অন্যত্র প্রায় এক সুরেই বললেন— 'জগতে যতটুকু পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যত তাহা এখানেই এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, আর কোথাও নাই। কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মন্দির ও খ্রিস্টানদের জন্য গীর্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, অন্য কোথাও নহে।... যদি তুমি অন্য কোনো দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন— ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্মসহিষ্ণুতা, শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

হিন্দুত্বের এই ব্যাপক ধারণাটি থেকেই একাত্ম মানব দর্শনের জন্ম। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানব দর্শনের আলোকে আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন। —'একাত্ম মানব দর্শনের মূল ধারণাটি এরকম যে, মানব সমাজ এবং মানবের চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্পূর্ণ জড় ও জীব জগৎ অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও, এদের সকলের একটি সম্মিলিত আত্মা আছে— যাকে আমরা ইংরেজিতে Ethos বা Soul বলতে পারি। বৈচিত্র্যটি উপর উপর, বাহ্যিক। সম্মিলিত আত্মা (Common Atma)-র কারণে সমস্ত কিছুই পরস্পর সহযোগী ও পরিপূরক। এই ধারণাটিই 'একাত্মতা' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।' (পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বিচার দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪)

এই যে একাত্ম মানব দর্শনের কথা বললেন দীনদয়াল উপাধ্যায়, তার ধারণাটিই দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজী। বলেছিলেন— 'এই ভারতে আপাত বিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান। অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা পরধর্মসহিষ্ণুতা। তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী, তোমার হয়তো বিশ্বাস তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন হয়তো বলিতে পারে সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাকাব্য পাঠ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব— একং স্বদিপ্রা বহুধা বদন্তি।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২)

ব্যাপক এবং সুগভীর এই হিন্দুত্ব ভাবনাকেই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড হিসাবে অভিহিত করেছিলেন স্বামীজী। বলেছেন— 'এই চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই; এইরূপ মহান সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

হিন্দু ধর্মের এই ব্যাপকতার কারণেই সে অবিনশ্বর এবং সনাতন এমন মনে করতেন স্বামী বিবেকানন্দের আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবও। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। কথামৃতে বর্ণনা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে একদল মাড়োয়ারি ভক্তবৃন্দ দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের ভক্তি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছেন। বলছেন— '...খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছে; যথার্থ হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম... হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যেসব ধর্ম দেখছ এসব তাঁর ইচ্ছাতে হবে, যাবে, থাকবে না। তাই আমি বলি ইদানীং যেসব ভক্ত তাদেরও চরণেভ্যোঃ নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে। বরাবর থাকবে।' (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৮৫)

শেষ করব স্বামীজীর সেই অমোঘ বাণী দিয়ে— 'সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক! মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ করব।' (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৯) ■

বঙ্গীয় যুবককুল ও বিবেকানন্দ

রাকেশ দাশ

বিশ্ববিজয়ী, বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার যুবকদের সামনে নিজেকে কলকাতার বালক বলে পরিচয় দিতে ভালবাতেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতির অন্তিম শিখরে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এই জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ সমগ্র জগৎ সংসারের মায়া মোহ কাটিয়ে চলে যাওয়ার পরেও তার হৃদয়ের অন্তস্থলে কোথাও যেন খুব মৃদু ধ্বনিতে গুঞ্জিত হতে থাকে---জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

কলকাতার যুবকদের সামনে তিনি বিপুল কণ্ঠঘোষের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, পাশ্চাত্যে যাওয়ার আগে ভারতকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পরে তিনি অনুভব করেন যে, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। স্বামীজী খুব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, ''ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ (চিহ্ন)। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত।'' (বর্তমান ভারত)

তিনি আরও বলেছেন, ''ধর্মই হিন্দুজাতির প্রকৃত জীবনীশক্তি; ধর্মই তাহার মূলমন্ত্র।...সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে--- তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। ...আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।'' (কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা)

এবং স্বামীজীর মতে হিন্দুত্ব এবং ধর্ম সমার্থক শব্দ। —''এখন ধর্ম ও হিন্দু— এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...যতদিন আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতে সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতেও প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব।'' (হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি। লাহোরে ধ্যান সিংহের হাবেলিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

সাম্প্রতিক সময়ে স্বামীজীর এই কথাগুলি স্মরণ করার পর্যাপ্ত কারণ উপস্থিত হয়েছে। কলকাতা নগরের রাজপথের ধূলায় বসে বিশ্ববরেণ্য স্বামীজী নিজের বাঙালি ভাইদের সঙ্গে প্রাণ খুলে নিজের মনের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মাত্র ৪৪ বছরের মাথায় সেই কলকাতা নগরের রাজপথ স্বামীজীর সেই হিন্দু ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে; সেই কলকাতার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়েছে অত্যাচারিতা হিন্দু ভগিনীর আর্ত চীৎকারে। অনিকেত, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে যে জন্মভূমির শ্রেষ্ঠতার গুঞ্জন অনুভব করেছেন বিবেকানন্দ— সেই জন্মভূমি ঘৃণ্য চক্রান্তে খণ্ডিত হয়েছে। যে লাহোরে তিনি হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি, বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন সেই লাহোরের আকাশে বাতাসে হিন্দু সর্বস্বান্ত মা-বোনদের হাহাকার গুঞ্জিত হয়েছে। যে করাচি স্বামীজীর পূত পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে সেই করাচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা বন্ধ হয়েছে। করাচি শহর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম পর্যন্ত ভুলেছে। বিশ্ববরেণ্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে কলকাতায় এসে নিজেকে কলকাতার বালক বলে পরিচয় দিয়েছেন সেই কলকাতার পথে ঘাটে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে যাওয়ার এতদিন পরেও আজ খোলা তলোয়ার হাতে জেহাদি রাক্ষসদের তাণ্ডব চলে।

আজ স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের ১২৫ বছর পরে আবার স্বামীজীর বাণীর পুনঃ অনুধ্যান প্রয়োজন। স্বামীজী ভারতবর্ষকে যে বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলি আবার ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন। বিশেষত, যুবকদের বোঝা প্রয়োজন। কারণ, যে যুবকদের উদ্দেশে স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, ''তোমরা যে আমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। হ্যাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই।'' কলকাতার বুকে স্বামীজী যাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছেন তাদেরই মধ্যে কয়েকজন বৌদ্ধিক দুষ্কৃতী স্বামীজীকে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের দালাল' উপাধিতে ভূষিত করেছে। স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার আওয়াজ তুলেছে কিছু বিপথগামী চরিত্রহীন যুবক।

এই পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন রুশপন্থী ও চীনপন্থীদের মুক্ত চারণভূমি ছিল। তাদের ভ্রান্ত ও হিংসক মতবাদ লক্ষ লক্ষ প্রতিভাশালী, প্রতিশ্রুতিবান যুবককে পথভ্রষ্ট করেছে। নৃশংসতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের হিংস্র দানবে পরিণত করেছে। বানতলা থেকে কামদুনি সেই দানবিকতার দগদগে ঘা নিয়ে বিশ্বের দরবারে

জাজ্বল্যমান।

দুঃখের বিষয় এটা নয় যে, এই দানবিকতা বঙ্গীয় যুবককুলের বিবেককে ভ্রষ্ট করেছে। দুঃখের বিষয় এটা যে, সেই দানবিকতাকেই আমরা প্রগতিশীলতা বলে প্রতিপাদন করেছি। দুঃখের বিষয় এটা নয় যে, প্রতিষ্ঠিত বিধর্মীরা ধর্মকে উৎখাত করে অধর্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। দুঃখের বিষয় এটা যে, দুর্গাপূজার পবিত্র আধ্যাত্মিকতাকে গ্রাস করেছে দুর্গোৎসবের মাতলামি আর নগ্ন হুল্লোড়। দুঃখের বিষয় এটা যে, এই নোংরামি আমাদের কাছে আধুনিকতা বলে প্রতিভাত।

নিজেদের পরিচয় ভুলে আমরা বাঙালিরা আজ মেকি প্রগতিশীলতার ধান্ধাবাজির ঢাক বাজিয়ে চলেছি অবিরাম। অন্য সম্প্রদায়ের অবৈধ হিংসা প্রদর্শনের জন্য দুর্গাপূজার বিসর্জন রুদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে নেতা নেত্রীদের পকেট ভরার জন্য বিশাল বিশাল দুর্গোৎসবের খুঁটিপূজায় মুখে রং মাখা সংদের সেলফির ভিড়ে সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখা দায় হয়ে উঠছে। দেবী দুর্গাকে বেশ্যা বলা এবং শিবের ত্রিশূলকে কণ্ডোমাচ্ছাদিত করা আমাদের কাছে স্বাধীনতার ওজস্বী বাণী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হয়ে উঠছেন। এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা নিতান্ত প্রয়োজন। কুয়োর ব্যাঙ ছিল স্বামীজীর দুই চোখের বিষ। শিকাগোতে স্বামীজীর প্রদত্ত ভাষণগুলির উপর চোখ বোলালে দেখা যায় যে, স্বামীজী সেখানে কোথাও কারও নিন্দা করেননি। ব্যতিক্রম কুয়োর ব্যাঙ।

আজ আমরা— পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা— মেকি প্রগতিশীলতা, ভণ্ড বামপন্থার কুয়োর মধ্যে বসে কেবল ব্যাঙের মতো মকমক করছি। সমগ্র জগতের দিকে চোখ খুলে তাকানোর মতো স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আমাদের জাগছে না। যাদের উদ্দেশে স্বামীজী পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা ত্যাগ করার জ্বালাময় উপদেশ দিয়েছিলেন সেই যুবকগণ বিবেকানন্দ বা শ্রীচৈতন্যকে ছেড়ে এমন একজনের ছবি আঁকা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজেদের আধুনিক বলে প্রমাণ করতে চাইছে যে লোকটি নিজের জীবনে হাজার হাজার মানুষকে নিজের হাতে খুন করেছে বিপ্লবের নামে।

স্বামীজীর পুনঃ অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আজ এজন্যই বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। আমরা আজ নিজেদের হিন্দু পরিচয়ে লজ্জাবোধ করছি, হিন্দু শব্দটিকে সঙ্কীর্ণতার প্রতীক বলে মনে করছি। কিন্তু, স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, ''আমরা হিন্দু। আমি এই 'হিন্দু' শব্দটিকে কোনো মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোনো মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।'' (হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি। লাহোরে ধ্যান সিংহের হাবেলিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

আমাদের এই হিন্দুত্বকে ধরে জেগে উঠতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কুয়োর বাইরে বিশাল জগৎকে। যে জগৎ বৈচিত্র্যে সুন্দর, প্রভাত পাখির কলকাকলিতে গুঞ্জরিত। উপলব্ধি করতে হবে সেই জগৎকে কলুষিত করছে দানবিক ভাবনায় জারিত রাক্ষসকুল। তাদের হাত থেকে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বাঁচানোর পবিত্র দায়িত্ব আমাদের। মার্গভ্রষ্ট মানবকুলকে মানবতার রাস্তা দেখানোর পূত দায়িত্ব আমাদের— কারণ আমরা বিবেকানন্দের ভূমির পুত্র। আমাদের বিবেকানন্দ 'ভাই' বলে সম্বোধন করে তার প্রাণের কথা বলতে চেয়েছেন।

আমাদের জাগতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে। জাগাতে হবে ধর্মের শক্তিতে, হিন্দুত্বের শক্তিতে। সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত করতে হবে হিন্দুত্বের যশোগানে। সমগ্র জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে ধর্মের দিব্য সুধা। কারণ, সমগ্র জগতের কল্যাণ আমাদের জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করে দিয়ে গিয়েছেন স্বামীজী। লজ্জাকর কাপুরুষতা এবং দাসসুলভ দুর্বলতা ত্যাগ করে সমাজের জন্য নিজেদের জীবনপাত করার উপদেশ দিয়েছেন। যে সমাজ ভারতের সমাজ— যে সমাজ ঐশী বাণীর অপেক্ষায় মক্কা, জেরুজালেম, ইউরোপ, ওয়াশিংটন কিংবা বেজিংয়ের দিকে তাকিয়ে নেই— সেই ভারতীয় সমাজের জন্য আমাদের জীবনপাত করতে হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভারতবর্ষের আত্মবিস্মৃত সমাজে। এই দায়িত্ব যদি আমরা পালন করতে না পারি তবে আমাদের জীবন বৃথা।

স্বামীজীর ভারত কল্যাণের কামনার পিছনে ছিল তাঁর বিশ্বজগতের কল্যাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ জগতের পক্ষে মঙ্গলকারক হবে এই ছিল স্বামীজীর আন্তরিক বিশ্বাস। স্বামীজী স্পষ্ট ভাষাতেই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন যে, ভারতবর্ষকে তার আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের শক্তিতে জেগে উঠতে হবে। জেগে উঠতে হবে সমগ্র মানব তথা সৃষ্টির কল্যাণকল্পে। হিন্দুত্বই সেই আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম। ভারতের হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা বা জাগরণ কোনোভাবেই কারও পক্ষে ক্ষতিকর নয়। হিন্দুত্বকে আশ্রয় করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সঙ্গে যারা হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানির জাতীয়তাবাদের মিল খুঁজে পান তারা নিছকই অজ্ঞ এবং অনুকম্পার পাত্র মাত্র। হিন্দুত্বের জাগরণ এবং তাকে ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের একমাত্র পন্থা। সেজন্য স্বামীজী সমগ্র জগতের কল্যাণ কামনায় ভারতবর্ষের জাগরণের কথা বলেছেন। তাঁর নিজের শব্দে—

''ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ— সে পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা— তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি। এ অবস্থা কখন হইতে পারে না। কর্মশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান্। **যাঁহারা মনে করেন হিন্দুধর্মের বর্তমান পুনরুত্থান কেবল দেশহিতৈষিতা- প্রবৃত্তির একটি বিকাশমাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত।**'' (হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা) ■

এই সময়

সেলফি-শিক্ষা

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মুকুটে আরও একটি পালোক যোগ হলো। তিনি

সেলফি তোলা শিখে নিয়েছেন। তার শিক্ষক হামজা সইফি নামে এক খুদে। টুইট বার্তায় বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'সইফি আমাকে সেলফি তোলা শিখিয়ে দিয়েছে।'

দরাজ

সারারাত পার্টি করেছেন? সকালে অফিসে যেতে ভালো লাগছে না? কুছ পরোয়া নেহি।

লন্ডনের একটি সংস্থা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে শরীর খারাপের অজুহাত দেওয়ার দরকার নেই। সত্যি কথা বলে ছুটি নিন। ডাইস নামের সংস্থাটি ছুটি দিতে প্রস্তুত।

বরাতজোর

নরওয়ের ড্যানিয়েল মোডোল বরাতজোরে বেঁচে গেলেন। মনোরম পাহাড়ি পরিবেশে

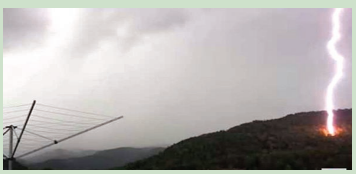

বাজ পড়ছিল আর তিনি ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি আর কানে তালা ধরানো আওয়াজে চমকে উঠলেন। দেখলেন তার থেকে কয়েক মিটার দূরে বাজ পড়েছে। প্রকৃতির হিসেব একটু ভুল হলেই...

সমাবেশ -সমাচার

ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধার্পণ সভা

বিবেকানন্দ স্টাডি-সার্কেল বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত বর্ষে দুদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্র, প্রবন্ধ ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। ২৫ আগস্ট বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকদের নিয়ে এবং ২৬ আগস্ট শহর ও

পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের ভক্ত ও অনুরাগী সুধীমণ্ডলীদের নিয়ে ২ ঘণ্টা ব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুর বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল ও যদুভট্ট মঞ্চ কমিটির যৌথ উদ্যোগে ওই দুটি সভা বিষ্ণুপুর যদুভট্ট মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বরানগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবপ্রদানন্দ, বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন শিক্ষক শক্তিপ্রসাদ মিশ্র। সফল প্রতিযোগীদের স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার উপর মূল্যবান গ্রন্থ অর্পণ করা হয় এবং সমস্ত প্রতিযোগীদের নিবেদিতার উপর পুস্তক, স্টাডি-সার্কেল প্রকাশিত স্মরণিকা এবং একটি করে শংসাপত্র দেওয়া হয়। প্রতিযোগীরা স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ জীবনে রূপায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭ আগস্ট কলকাতার মানিকতলাস্থিত নরেশ ভবনে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সহ-সম্পাদক গুরুশরণ প্রসাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। গুরুশরণজী প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা

এই সময়

ফটোকে আটক

নতুন লাইনে নামা চোর ঠিক করেছিল একটি দোকানে চুরি করবে। কিন্তু ঠিক ঢোকার

সময়েই শাটার এসে পড়ল পায়ের ওপর। কিছুক্ষণ টানাটানি করে চোরবাবাজি বুঝল মুক্তি অসম্ভব। বিকেল চারটে থেকে বন্দি। সকালে উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটা চীনের।

লা টোমাটিনা

স্পেনের বিখ্যাত টোম্যাটো ছোঁড়ার উৎসবের নাম লা টোম্যাটিনা। এবারে

উৎসবের কেন্দ্র ছিল ছোট্ট শহর বুনোল। ১৬০ টন পাকা টোম্যাটো ২২,০০০ মানুষ নিজেদের মধ্যে ছোড়াছুড়ি করে আনন্দে যেতে ওঠেন। জোয়া আখতারের ছবি 'জিন্দেগি না মিলেগি দুবারা'-তে দেখা গেছে এই উৎসব।

মশার জন্য

জাপানের নামুচিপিকোভা একটি মশা মেরে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট

করেছিলেন। ক্যাপশন ছিল, 'আমি যখন বিশ্রাম করছি তুমি আমায় বিরক্ত করছ কেন? এখনই মরো'। এমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য টুইটার নমুচির অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। গত বছরের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী এবং সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদিকা শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ। গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ পিনাকী পাল। সংস্থার পুস্তিকা সেবা চেতনার আবরণ উন্মোচন করেন গুরুশরণ প্রসাদ, অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং বীরেন্দ্র তেওয়ারী। সভাপতির বক্তব্য রাখার পরে সঞ্চালক প্রদ্যুৎমল বসু সকলের সঙ্গে পরিচয় করান। সেবা চেতনার উপরে বক্তব্য রাখেন শঙ্কর সরকার। মার্গদর্শন করান অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং গুরুশরণ প্রসাদ।

নরেশ চন্দ্র নাগের পৌরহিত্যে ২০১৭-১৮ সালের নতুন পরিচালন সমিতি নির্বাচিত হয়। সভাপতি— বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী, কার্যকরী সভাপতি— শিবদাস বিশ্বাস, সহ-সভাপতি— অলোক মুখার্জী, সম্পাদিকা— শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ, সহ-সম্পাদক— প্রদ্যুৎমল বসু, কোষাধ্যক্ষ— পিনাকী পাল, কার্যালয় সম্পাদক— কমল চ্যাটার্জী, সদস্য— সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, রাজকুমার ঝা, শঙ্কর সরকার, শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল।

সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিবদাস বিশ্বাস। দক্ষিণবঙ্গের সহ-সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ এবং বাস্তুহারা সহায়ক সমিতির প্রদেশ সম্পাদক তপন গাঙ্গুলী-সহ প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভা

গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তৃতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া উষা তাই চাঁটির স্মরণ সভা কলকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হয়।

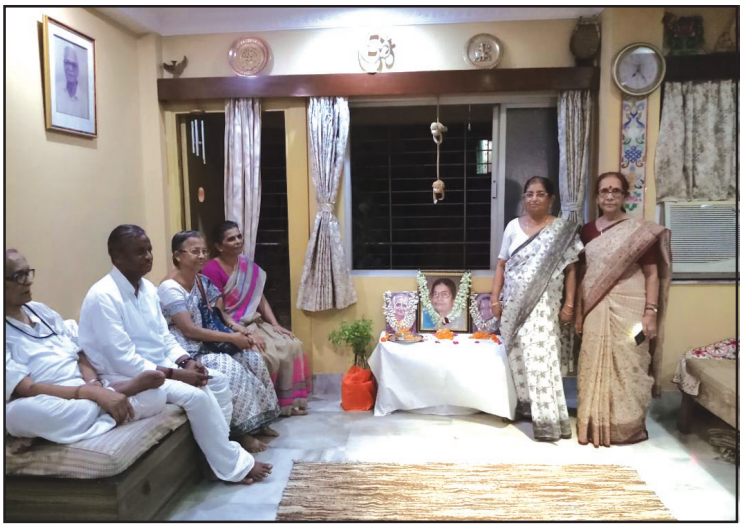

উপস্থিত ছিলেন স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কার্যকর্তা অদ্বৈত চরণ দত্ত, কেশবরাও দীক্ষিত, সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হালদেকর। পশ্চিমবঙ্গের কার্যবাহিকা রীতা চক্রবর্তী ক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর এবং সেবিকা সমিতির সেবিকা বোনেরা।

মায়াপুরে ইস্কন মন্দিরে রাধাষ্টমী উৎসব

গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট মায়াপুর ইস্কন মন্দিরে দু'দিন ধরে রাধাষ্টমী হয়ে গেল। এই উৎসব উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত করা হয়। ভক্তেরা ভজন-কীর্তন ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে রাধামাধবের অর্চনা করে। রাধার জন্মলীলা উৎসব

এই সময়

অভিমানিনী

মিস ইউকে জোয়ে স্মেলকে ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন একটি আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ। ক্ষুব্ধ স্মেল সেই প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কোনওকিছুর জন্যেই তিনি নিজেকে বদলাতে চান না।

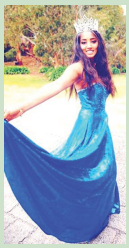

তেলেগু বিজয়

কাকিনাড়া পুরসভার নির্বাচনে চোখধাঁধানো সাফল্য অর্জন করল চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন তেলেগু দেশম দল। পুরসভার ৪৮টি ডিভিসনের মধ্যে ৩২টিতেই তারা জয়লাভ করেছে। তেলেগু দেশমের

জোটসঙ্গী বিজেপি জিতেছে ৩টি ডিভিসনে।

সৌজন্য

শ্রীলঙ্কা সরকার সে দেশে বন্দি ৭৬ জন ভারতীয় ধীবরকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য দু'দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের আগে এটি শ্রীলঙ্কার সৌজন্যমূলক পদক্ষেপ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

দর্শন করার জন্য এই সময় বহু ভক্ত মায়াপুরধামে সমবেত হন। উল্লেখ্য, ইস্কুনের অন্যান্য মন্দিরেও জাঁকজমকের সঙ্গে রাধামাধব উৎসব পালিত হয়। কৃষ্ণ ভক্তদের কাছে শ্রীরাধা কৃষ্ণেরই এক রূপ এবং এ কারণে এক বড় উৎসব।

চক্ষুদানের অঙ্গীকার

সমদৃষ্টি ক্ষমতা বিকাশ এবং অনুসন্ধান মণ্ডল সংক্ষেপে সক্ষম সম্প্রতি একটি সভার আয়োজন করেছিল। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা

অশোক বেরি চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য, সক্ষম অন্ধত্বমুক্ত ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে অনেকদিন ধরে।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার শিবির

গত ৩০ জুলাই দুর্গাপুর সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ইছাপুর সেবা ভবনে লায়নস্ ক্লাবের সহযোগিতায় এক চক্ষুপরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ইছাপুর ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রায় ২০০ জন নাম নথিভুক্ত করেন এবং ১৯০ জনের চক্ষুপরীক্ষা করা হয়। ৩৫ জন রুগিকে ছানি অপারেশন করার জন্য নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে দুর্গাপুর লায়নস্ ক্লাবের হাসপাতালে বিনামূল্যে ২২ জনের চোখের ছানি কাটা হয়। স্বল্পমূল্যে বারশোজনের চশমার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবিরে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সহযোগীদের সংখ্যা ১৫ জন ছিল। সুন্দর ব্যবস্থাপনায় বিপুল উৎসাহে এই চক্ষুশিবির সেবা বিভাগের পরিচালনায় করা হয়। নগর সঙ্ঘচালক অশোক বেরার এবং সেবা সংস্থার সহ-সভাপতি দেবশিস চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

চক্রান্তের তত্ত্ব তুলে কচকচানি লজ্জাকর

অতিথি কলম

চেতন ভগত

জন্মলগ্ন থেকেই আম আদমী পার্টি নির্দিষ্ট এক ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তাদের রাজনৈতিক মূলধন বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে গেছে। এর মধ্যে রাস্তার ধারে ধারে বসে বা দাঁড়িয়ে হল্লা করা, হঠাৎ হঠাৎ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিত্যনতুন আজগুবি তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও রয়েছে। এই সব সম্মেলনে তারা নাকি সর্বদাই কিছু না কিছু কেলেঙ্কারি উন্মোচন করে থাকে। যার ফলে কালিমালিপ্ত করা যায় অন্য বিরোধী নেতাদের। সর্বশেষ ধান্দাটি হলো চক্রান্তের তত্ত্ব ছড়িয়ে দেওয়া— যেমনটা হয়েছিল উত্তর প্রদেশ বা পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের পরে কিংবা রাজৌরি গার্ডেন উপনির্বাচনে জামানত জব্দ হওয়ার ক্ষেত্রে। এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ইভিএম যন্ত্রে ব্যাপক কারচুপি করেছে এই প্রচারই বাজারে করেছিল।

সারা বিশ্ব জুড়ে অবশ্য এই চক্রান্ত তত্ত্বের একটা চালু বাজার আছে। নাগরিকদের বেশ বড় একটা অংশই বরাবর অবিশ্বাস্য কোনও কিছুকে বিশ্বাস্য বলে ভাবতে ভালবাসে। বিশেষ করে রাজনীতির জগতে চক্রান্ত, চক্রান্ত বলে ধ্বনি তোলা তো সব কিসিমের রাজনৈতিক দলের মধ্যেই মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের একটা অংশ বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন যে ঈদের বিশাল জমায়েতের সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা হয়তো দ্রুত জন্মহার বাড়িয়ে কীভাবে সংখ্যায় হিন্দুদের টপকে যাওয়া যায় তা নিয়ে কানাঘুষো করেন। এই মহলে আরও একটা আংশিক সত্য তত্ত্বও খুবই আলোচিত হয় যে তথাকথিত উদারবাদীরাই মিডিয়াকে প্রভাবিত করে থাকেন। ক্ষমতাবাদনদের সঙ্গে 'Lutyens Delhi' ঘরানার সংবাদমাধ্যমের লোকেরা একসঙ্গে নানান ধরনের তরল নিয়ে বসে মতলব করেন কী করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর যাবতীয় ভাল কাজগুলিকে প্রচারের অন্তর্ঘাতে মন্দ বলে চালাবেন।

অবশ্যই বামপন্থীরাও এই চক্রান্ত-প্রেমের বাইরে নয়। এদের বড় অংশ বিশ্বাস করে আদানী আর আম্বানীরাই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা নিয়ম করে বিভিন্ন চ্যানেলের সম্পাদকদের প্রতিদিন ডেকে পাঠিয়ে ঠিক করে দেয় সেদিন 'প্রাইম টাইমে' কোন খবরটি কতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হবে। তারা এটাও গভীর ভাবে বিশ্বাস করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাঝে মাঝেই সঙ্ঘের প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে পাঠিয়ে বলে থাকেন দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র করে তোলা না হলে তোমার চাকরি যাবে।

কেন মানুষ চক্রান্ত তত্ত্বে বিশ্বাস করে তা নিয়ে বিশিষ্ট মনোবিদরা নানা রকমের বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে বাস্তবে যখন চক্রান্তের স্বপক্ষে কোনো তিলত্র প্রমাণও নজরে পড়ছে না তবুও তারস্বরে চিৎকার চলছে। মাঝে বিশ্লেষকদের গবেষণাপত্রগুলিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তাঁরা বলেছেন চক্রান্ত চক্রান্ত তত্ত্বে বিশ্বাস করতে ভালবাসেন এমন মানুষ মোটেই প্রান্তিক বা কিছুলোক এমনটা বলা যাবে না। তাঁরা মোট মোটামুটি ভাবে জনসংখ্যার এক শতাংশ বা অনেকও হতে পারে'। ধরুন, ওবামা জন্মসূত্রে আমেরিকান নয় (যদিও তাঁর মার্কিন দেশে জন্মানোরই জন্ম পঞ্জিকা আছে)। কিংবা ৯/১১-এর মহাধ্বংস আদতে একটি অভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাত অর্থাৎ নিজেদের ভেতর থেকে ঘটানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে এত টানাপোড়েন তা আসলে ভাঁওতা। মজার কথা এগুলিকে আদ্যপ্রান্ত বিশ্বাস করার মানুষের সংখ্যা সবদেশে তো বটেই,

> দু'বার বড় জয়ের পর 'আপ' যেই হারতে শুরু করল তাদের তত্ত্ব বেরোল ইভিএম মেশিনে জালিয়াতি করা হয়েছে। তারা নিজেরাই একটি মেশিন তৈরি করে দেখাল কীভাবে ভোট যন্ত্রে জালিয়াতি করা যায়। কিন্তু ওই মেশিনটি যাতে সহজেই জালিয়াতি করা যায় তা প্রমাণ করার জন্যই তারা তৈরি করেছিল। তাই তাদের এই পরীক্ষামূলক প্রদর্শন কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি কেননা সেটি নির্বাচন কমিশন পরীক্ষিত মেশিন নয়।

পৃথিবীর উন্নততম তথা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশটিতেও মোটেই কম নয়।

বিখ্যাত রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক Uscinski ও Parent তাঁদের তত্ত্বে বলেছেন, চক্রান্ত তত্ত্বের মূলত চারটি বৈশিষ্ট আছে। (১) একটি দল বা গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত হয়, (২) এরা গোপনে কাজ করে, (৩) প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাকে খর্ব করা, ক্ষমতা দখল করার বাসনা, সত্য গোপন করা বা নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা, (৪) আর সব সময়ই এটি চাউর করা হয় সমষ্টির স্বার্থের বিনিময়ে অর্থাৎ তাদের ক্ষতি করে।

আধুনিক পৃথিবীর অনেক প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলই আমরা অনেক সময় জানি না বা বুঝতে পারি না। বিশেষ করে মানুষের দ্বারা ঘটানো বিভিন্ন অঘটন (এক্ষেত্রে নির্বাচনী ফলাফল) যদি আমাদের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে যায় বা যে ফলের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে— ঠিক তখনই আমরা ওই চক্রান্ত তত্ত্বটিকে নির্বোধের মতো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি।

এই সূত্রে 'আপ দলের' মহাপণ্ডিতী পর্যবেক্ষণটি দেখা যেতে পারে। 'সব মিলে হুয়ে হায়জী'— এর সঙ্গে সকলেই জড়িত। কিংবা 'দিল্লিতে আপকে কেউ ভাল কাজ করতে দিতে চায় না' বা 'সরকার তো চালাচ্ছে আদানী, আর আম্বানীরা'। এই সব চক্রান্ত তত্ত্ব আকণ্ঠ বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই। তবে সবসময়ই এর ভিত্তিতে আপকে নির্বাচন জিতিয়ে দেবে এমন সংখ্যায় তারা আর নেই। দু'বার বড় জয়ের পর 'আপ' যেই হারতে শুরু করল তাদের তত্ত্ব বেরোল ইভিএম মেশিনে জালিয়াতি করা হয়েছে। তারা নিজেরাই একটি মেশিন তৈরি করে দেখাল কীভাবে ভোট যন্ত্রে জালিয়াতি করা যায়। কিন্তু ওই মেশিনটি যাতে সহজেই জালিয়াতি করা যায় তা প্রমাণ করার জন্যই তারা তৈরি করেছিল। তাই তাদের এই পরীক্ষামূলক প্রদর্শন কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি কেননা সেটি নির্বাচন কমিশন পরীক্ষিত মেশিন নয়।

মনে রাখা দরকার, তাদের এই নমুনা প্রদর্শনের আওতায় বড় আকারের নির্বাচনী কারচুপির কোনো কৌশলই দেখানো হয়নি। আমাদের দেশে ১০ লক্ষের বেশি ভোটকেন্দ্র আছে। মেশিনগুলি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। সেই কারণে এই এত লক্ষ মেশিনে কারচুপি করতে গেলে তত লক্ষ বুথের অন্তত একজন ভোটারকে সংশ্লিষ্ট মেশিনটিতে জালিয়াতি করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে যদি আদৌ আপের আজগুবি কথাকে সত্য বলে ধরা যায়। আর যদি এতকাল ধরে লক্ষ লক্ষ বুথে এই কাণ্ড ঘটে থাকে তাহলে নিদেন পক্ষে দু'চারজন তো এনিয়ে এসে এত বড় বেনিয়ম সম্পর্কে কিছু বলবে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিজেপি'র লক্ষ লক্ষ এজেন্ট লক্ষ লক্ষ বুথে এক মহা জালিয়াতি যজ্ঞে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এটা সত্যি বলে ধরে নিলেও বোঝা যায় না যে ২০১৫-তে আপ ৭০টির মধ্যে দিল্লিতে কী করে ৬৭টি আসন জিতল। আর পঞ্জাবে বা বিহারে বিজেপি হারলই বা কেন। 'আপের' তত্ত্বে এটারও মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী যে দল বা ব্যক্তি জয়ী হবে বলে আলাপ আলোচনার ঝড় তুলত বাস্তবের ফলাফলে দেখা গেল তিনিই বা সেই দল জিতেছে। এই ফলাফল জাতির তৎকালীন সমষ্টিগত মানসিকতারই প্রতিফলন বলে গণ্য করা হয়। আর হঠাৎ করে কাগজের ব্যালটে ফিরে যাবার দাবি আরও অসার। এই ব্যালটগুলিতে কারচুপির ক্ষেত্রে কী হবে? অবশ্য এমন একজন ব্যক্তি যিনি ১০ লক্ষ ইভিএমএ কারচুপি করে দিতে পারেন তিনি কাগজের ব্যালটেও অনায়াসে তা করে দেখাতে পারবেন, তাই না?

তাই বলছি, এই সব যুক্তি নির্ভর তর্ক-বিতর্কের অবকাশ কিন্তু চক্রান্ত তত্ত্ব-প্রেমিকদের কাছে নেই। আমার নিজের করা Twitter Poll-এর পছন্দে দেখেছি যে দেশের ৬৪ শতাংশ লোক বিশ্বাস করে দেশের নির্বাচন পদ্ধতি আইনসঙ্গত ও নীতিনিষ্ঠ— সেখানে কোনো কারচুপি নেই। কিন্তু ২১ শতাংশ লোক মতামত দিয়েছে মেশিনগুলিতে জালিয়াতি করা হয়। বাকি ১৫ শতাংশ ঠিক কী ভুল এখনও মনস্থির করতে পারেনি। মনে রাখা ভাল, এই ধরনের লোকেদের জন্য কোনো যুক্তিই কাজে আসবে না। আগামী নির্বাচনগুলিতে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বোতাম টেপার পরই যথাযথ কাগজের স্লিপ হাতে চলে আসবে। যাকে ভোট দেওয়া হয়েছে দেখা যাবে। কিন্তু এতেও খুব বড় হেরফের হবে না। আগে থেকে ফলাফল খারাপ হলে কী বলব, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা মতলবি লোকেদের সংখ্যার জেরে 'আপ' বেশি দূর যেতে পারবে না। ভারতীয় রাজনীতি এখন করে দেখানোর নীতিতে বিশ্বাসী। কথাটা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

আমাদের মতো ব্যক্তি মানুষদের অবশ্যই খারাপ লাগবে যখন অপ্রমাণিত তত্ত্ব অর্থাৎ মিথ্যেটাই যদি চাউর হতে থাকে। ভিন্ন গ্রহে জীবের বাস আছে এই তত্ত্বে অনেকে বিশ্বাস করেন। তাতে অসুবিধে কিছু নেই, কেননা তাঁরা কারুর ক্ষতি করছেন না। কিন্তু কেবলমাত্র আজগুবি চক্রান্ত তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে যদি আমরা দেশের বিশিষ্ট ও যত্নে গড়ে ওঠা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কালিমা লেপনের চেষ্টা করি, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বালখিল্যের মতো প্রশ্ন তুলি তা কিন্তু হবে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

একটা চক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে সরগোল পাকাবার আগে প্রত্যেককেই সেটিকে নিয়ে দু'বার ভাবতে হবে। ধরুন কেউ হয়তো বলল আমার লেখা বইগুলোর পাতায় নিষিদ্ধ ড্রাগ মাখানো থাকে— সেই লোভেই অনেকে এগুলো পড়তে আসে। কী করবেন? সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন?

পত্রিকার সংযোজন : সদ্য ঘোষিত 'বাওয়ানা' উপনির্বাচনে আপ প্রার্থী রামচন্দ্র বিজেপি প্রার্থীকে ২৪০৩২ ভোটে হারিয়ে দিয়েছে। বিজেপির কিছু ভোট কমেছে। কংগ্রেসের ভোট বেশ বেড়েছে। কেজরিওয়ালের বালখিল্য বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

চিঠিপত্র

তিন তালাক

ধন্যবাদ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে। যে ভাবে এক ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিমকোর্ট গত ২২ আগস্ট দিয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। অসংখ্য মুসলমান মহিলার সম্মান, আবেগ ও জীবনকে রক্ষা করেছে এই রায়। চিরতরে বন্ধ হতে চলেছে--- তালাক-ই-বিদ্দত বা তিন তালাক। এই কুপ্রথা মুসলমান মহিলাদের জীবনকে জর্জরিত ও নরক করে তুলেছিল। কত মহিলা নেমে গিয়েছিল অন্ধকার নরকের পথে। সুপ্রিমকোর্টের এই ঐতিহাসিক রায় তাঁদের অন্ধকার জীবনকে কিছুটা হলেও ভরিয়ে তুলবে আলোকচ্ছটায়। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে তিন তালাক প্রথা রদ হয়েছে বহুদিন আগে। সেইদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এই প্রথা বজায় রাখাটা ছিল একটা লজ্জার ব্যাপার। ভারতবর্ষের অতীত প্রধানমন্ত্রীগণ এই কুপ্রথা দূরীকরণের ব্যাপারে কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেননি। অবশ্য তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাবে তিন তালাক বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তার জন্য তাঁরও ধন্যবাদ প্রাপ্য। এখন সব বিরোধী দল সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেও লক্ষণীয় ভাবে চুপ কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও তাদের এক মন্ত্রী অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

—নরেশ মল্লিক,
পুর্ব বর্ধমান।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে

দিদি গো,

তুমি আমাকে এই ছড়া-কাম কবিতাটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছ, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছ, তাই তোমার সাম্প্রতিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে এই রচনাটি পেশ করলাম, অপরাধ নিও না।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
গঠ্বন্ধনের বাজনা বাজে।
বাজতে বাজতে চলল দিদি,
জনে জনে সাধাসাধি;
অখিলেশ, লালু, রাহুলটা,
বহেনজী ওড়ায় দোপাট্টা।
আয় ববি দিল্লি যাই,
অ্যান্টি-মোদী গ্যাং বানাই।
নীতীশব্যাটা ছ্যাঁচড়া,
ভাজপায় গিয়ে নাড়ছে কড়া।
পি.এম আবার হবে মোদী?
কাড়বই এবার মোদীর গদি।
দিদির স্বপ্ন পিএম হবে,
বামন হয়ে চাঁদ ধরবে।
যখন যাবে উভয় কূল,
দেখবে চোখে সর্ষের ফুল।

—সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায়,
বালিগঞ্জ, কলকাতা।

হিন্দু দেব-দেবী কি এত অসহায়?

ফিদা হুসেন থেকে শুরু করে আমিরের 'পিকে' হিন্দু দেব-দেবীকে উপহাস করেই জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। অতীতে সোমনাথ মন্দির লুঠ হওয়ার কথা জানা যায়। সম্প্রতি কালিয়াচক, বসিরহাট সব জায়গাতেই হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির ভাঙচুর হয়েছে। হিন্দু দেব-দেবীরা কি এতই অসহায়? আর আমরা হিন্দুরা প্রতি পদে কাপুরুষোচিত অন্যায়টাকে মেনে নিতে শিখে গেছি। কারণ আমরা আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীকে শ্রদ্ধা জানাতে অক্ষম। যেমন পথে চলতে গিয়ে দেখা যায় বাড়ির দেওয়াল যেখানে নির্জনতার সুযোগে কেউ প্রস্রাব করতে পারে সেসব জায়গায় হিন্দু দেব-দেবীর ছবি। অফিসে যেখানে পানের পিক ফেলার সম্ভবনা রয়েছে সেখানে দেব-দেবীর ছবি, নাগরিক বর্জ্য ফেলার জায়গাতেও হিন্দু দেব-দেবী। এছাড়া পুরনো দেব-দেবীর অনেক মূর্তিকে অস্থায়ী প্রস্রাবাগার অথবা নোংরা স্তূপে ফেলে রাখতে দেখা যায়। এ কেমন শ্রদ্ধা, কেমন হিন্দুয়ানা ভক্তি? আরাধ্য ও উপাস্য দেব-দেবীর প্রতি সংকীর্ণ হিন্দু মানসিকতা বর্জিত হোক। আমরা আরাধ্য দেব-দেবীকে অতি সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারি না। এ যেন ধর্মেরই অপমান। ধর্মের আদর্শ-প্রতীক দেব-দেবী ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে না পারলে আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার অযোগ্য। বিশ্বের কোনও ধর্মের মধ্যে এ ধরনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

—প্রণব সূত্রধর,
আনন্দনগর, আলিপুরদুয়ার।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

বাংলাদেশে হিন্দু বিতাড়ন রোধে পশ্চিমবাংলায় বিজেপির প্রয়োজনীয়তা

চন্দন কুমার রায়

১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের সমষ্টিগত রাজনৈতিক বা সামাজিক ভাবে শক্তিশালী কোনো সংগঠন ছিল না। ২৮ শতাংশ হিন্দু সংখ্যালঘু হলেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনগোষ্ঠীর শক্তিশালী প্রভাব ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। রাজনৈতিক আদর্শে প্রায় সবাই ছিল গান্ধী ও নেহরুপন্থী কংগ্রেসের সমর্থক, আর স্বল্পসংখ্যক ছিল তেভাগা আন্দোলনের প্রভাবে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী এবং যোগেন মণ্ডলের পাক অনুসারী জাতিগোষ্ঠী। এই ত্রয়ী রাজনৈতিক শক্তি ছিল বাংলা ভাগ তথা ভারত ভাগের পক্ষে শক্তিশালী সহযোগী শক্তি ও অনুঘটক। তাই যখন বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হলো পূর্ববাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মাথার উপর আঘাত নেমে এলো। তখন পূর্ববাংলায় হিন্দুদের শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে হিন্দু জনজাতি দিশেহারা হয়ে পড়ল। কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না, নেমে এলো পাকিস্তান শাসক ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর অমানবিক নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, লুটপাট, সম্পত্তি দখল, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি। শুরু হলো পূর্ববাংলায় সাতপুরুষের ভিটেমাটি, ব্যবসা, চাকরি ছেড়ে পালানোর পালা। যদি তখন দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করে নিত তাহলে তাদের এই অর্থনৈতিক ও শারীরিক নির্যাতনের ক্ষতি বহন করতে হতো না। শুধু মাত্র পূর্বপুরুষের দেওয়া নাম, বংশমর্যাদা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য ভারতে পালিয়ে এসে তাদের কলোনি জীবন বেছে নিতে হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশে হিন্দুজনগোষ্ঠী ২৮ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা অচিরে শূন্য হয়ে যাবে।

অথচ, পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতে কোনোদিন এর সেইরকম জোরালো প্রতিক্রিয়া হয়নি। বিগত ৭০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের মতো একই অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবাংলার শাসক গোষ্ঠীর (কংগ্রেস, সিপিএম, টিএমসি)-এর অদূরদর্শিতা ও ভোটব্যাঙ্কের লালসা পাকিস্তানপন্থী মুসলমান জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী করে তুলেছে। যার ফল স্বরূপ ঘটে চলেছে কালিয়াচক, মালদা, কাটোয়া, দেগঙ্গা, নামখানা, উলুবেড়িয়া, নৈহাটি, মেটিয়াব্রুজের ঘটনা, তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ন, সলমান রুশদিকে প্রত্যাখ্যান করা, ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্র, হিন্দু নিধনের জন্য অস্ত্র, বোমা কারখানা তৈরি প্রতিমা বিসর্জনে বাধা, সরস্বতী পূজা বন্ধ এবং সর্বোপরি মুসলমান গুণ্ডাবাহিনীর টিএমসি সেজে বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার, বিজেপির লালবাজার চলো মিছিলে মসজিদ থেকে হামলা ইত্যাদি।

এইসব ক্ষেত্রে কংগ্রেস, সিপিএম, টিএমসি নেত্রীবৃন্দ এমনকী বাংলার সংবাদমাধ্যম তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ নীরব, মূক ও বধির। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। তাই বাংলা ভাগের বলি উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান হয়ে আমি শঙ্কিত ও ভীত।

আমি মনে করি, এই পাকপন্থী ইসলামি ষড়যন্ত্র এবং আগ্রাসন থেকে পশ্চিম বাংলাকে এবং সমগ্র বাংলার মানুষদের রক্ষা করতে দরকার ৭০ বছর ধরে বাংলার বুকে বিরাজমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। একমাত্র হিন্দু দরদি এবং দেশপ্রেমী রাজনৈতিক ক্ষমতাই পারে বাংলার মাটি ও হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে। হিন্দুপ্রেমী এবং দেশপ্রেমী রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনজাগরণ তৈরি করে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করা দরকার। যখন এমন রাজনৈতিক দল পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবে তখনই একমাত্র সম্ভব পাকপন্থী ইসলামি ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া। তখনই আমরা সকল ভারতবাসী সুরক্ষিত হব।

এই মাটি এই দেশ আছে বলেই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, টিএমসি ও বিজেপি— আমরা সবাই আছি। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের যৌথ সহযোগিতায় মুসলমান জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তান নামক দেশ উপহার হিসেবে দেওয়া হলো। তবুও ইসলামাবাদ বা ঢাকাতে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসি পতাকা উড়তে দেওয়া হয় না। সমস্ত কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে অতএব তাদেরও ভাববার সময় এসেছে। তাই সরল হিন্দু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের স্বার্থে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত আবাস ভূমিগঠনে হিন্দুপ্রেমী বীর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে গড়া ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ক্ষমতায় আনা খুবই সময়োপযোগী ও আবশ্যক। আমার পূর্বপুরুষেরা সংগঠিত উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে পূর্ববাংলার মাটিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে আজ পূর্ববাংলায় হিন্দুরা ক্ষয়িষ্ণু জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে যদি পশ্চিমবাংলা তথা সমগ্র ভারতে হিন্দু জনগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল সেই একই রকম প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করত আজ তা হলে ওই দুই দেশে হিন্দুদের ওপর সকল অত্যাচার বা নিপীড়ন অবশ্যই বন্ধ হোত। সকল ক্রিয়ারই সম প্রতিক্রিয়ায় সাম্য অবস্থা ফিরে আসে। এটাই স্বাভাবিক ও বিজ্ঞান। পশ্চিমবাংলায় শক্তিশালী হিন্দু দরদি সরকার থাকলে এপার ওপার সমগ্র বাংলায় হিন্দুজনগোষ্ঠী সুরক্ষিত থাকবে আর তখনই পাকিস্তান পন্থীদের আগ্রাসন নিপাত যাবে। এই সময়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে বাংলার মানুষকে হিন্দু জাগরণ সংকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানুষের মুখ থেকে ইনক্লাব জিন্দাবাদ মুছে গিয়ে জয়হিন্দ, ভারত মাতা কী জয় ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি ঝঙ্কারিত হবে, এটাই আশা করব।

অরন্ধনে মায়েদের ছুটি

পরম্পরা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারত তথা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র যৌথ পরিবার ছিল। যৌথ পরিবারে বাড়ির গৃহিণী বা গৃহকর্ত্রীকে প্রত্যহ অনেক লোকের রান্নাবান্না করতে হোত। সেকালে যৌথ পরিবারের মায়েরা রান্নাবান্না থেকে ছুটি পেতেন না। প্রত্যহ গৃহে উনুন জ্বালানো ও রান্না করা একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল। এর থেকে মায়েদের পরিত্রাণ ছিল না। বর্তমানে শহর কলকাতায় ও শহরতলিতে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সকালে না হলেও সন্ধ্যাতে উনুন বা গ্যাস জ্বালানো বারণ। অফিস ফেরত বাবুরা বিভিন্ন খাবারের দোকান থেকে রুটি তরকারি কিনেই বাড়িতে ঢুকছেন, আবার কারো কারো গৃহে মাসিক ব্যবস্থা, তৈরি করা খাবার নির্দিষ্ট সময়ে গৃহে পৌঁছে যাচ্ছে। যাকে এখন হোম সার্ভিস নামকরণ করা হয়েছে। মুঠিফোনে শুধুই খবরের অপেক্ষা। টাকার ব্যবস্থা ক্যাশলেশ সিস্টেমে, কোনো চিন্তা নেই।

এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিজীবনে বাল্যে, কৈশোরে যতদিন গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে ছিলাম, তখন গরম ভাত দুই বেলা খাইনি এমনদিন স্মরণ করা কষ্টকর। এক আধ দিন হয়ত বা মায়ের জ্বর হয়েছে কিন্তু রান্না কোনোদিনই বন্ধ হয়নি। আর দেখতাম ঘরের এতগুলো লোক, তার পর নিত্য দু'চারজন অতিথি হাজির। প্রত্যেক দিনই মাকে বেশি করে চাল নিয়ে রান্না করতে দেখতাম। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন— তিথি দেখে আসে না বলেই না তারা অতিথি। এই ভাবনা এখন আর কেউ ভাবেন বলে মনে হয় না। আমরা নারী স্বাধীনতার যুগে বাস করি কিনা তাই ওসব ভাবনা অচল।

হয়তো বলবেন যে তৎকালে সমাজে নারীদের প্রতি অবিচার করা হোত। তাদের স্বাধীনতা ছিল না। ক্রীতদাসীদের মতো নিত্য রান্নাবান্না করতে হোত একদিনও বাদ যেত না। এই কথাটি কিন্তু ঠিক নয়। সনাতন ভারতবর্ষে প্রজ্ঞাবান ঋষিরা স্ত্রীলোকেদের

স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরও ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে আমাদের সমস্ত কর্মের কৃত্যানুষ্ঠানের পশ্চাৎপটে ধর্মকে স্থান দেওয়া হয়েছে। নববর্ষায় আষাঢ়ের অম্বুবাচীকে যেমন পক্ষান্তরে চাষিদের ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা যায় তেমনি অরন্ধনকেও আমাদের মা বোনেদের ছুটির দিন হিসেবে গণ্য করা যায়। এখন এই অরন্ধন বিষয়টি কী সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

অনুষ্ঠানিক ভাবে রান্না না করাকে অরন্ধন বলে। বাংলাদেশে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধনের রীতি আছে। কোনো কোনো স্থানে দশহরার দিন থেকে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে ও অন্যান্য দিনে অরন্ধন পালিত হয়ে থাকে। সাধারণ লোকেরা এই রান্না না করার রীতিকে 'আরন্ধ' বলে, অরন্ধনের পূর্ব রাত্রিতে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা অন্নব্যঞ্জনাদি বেঁধে রাখেন এবং ভাত নষ্ট হয়ে যাবে বলে, ভাতে জল দিয়ে রাখেন। অরন্ধনের দিন উনুন জ্বালতে নেই এবং আগুনের কাছে মায়েদের যেতে নেই। ওইদিন গৃহিণীরা উনুনের বাইরে ও ভিতরে আলপনা দেন এবং ঘরে মনসা পূজা করেন। কোথাও কোথাও উনুনের ভিতর মনসা গাছের ডাল রেখেও মনসা পূজা করা হয়ে থাকে। আর পূর্বরাত্রে রান্না করা বাসি ভাত তরকারি খাওয়ার প্রথা। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন পালিত হয় তাকে বৃদ্ধারন্ধন বলে। ওই অরন্ধন যদি ভাদ্র মাসের অন্যদিন অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে ইচ্ছারন্ধন বলে। এই প্রথাতে বাসি অন্ন-ব্যঞ্জন মনসা দেবীকে উৎসর্গ করে গ্রহণ করবার রীতি।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? উত্তরে বলা যায় সমাজকে বাদ দিয়ে ধর্মানুষ্ঠান হতে পারে না। এক সময় বিশেষত ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাংলাদেশে তাঁতি ও কর্মকার সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তখন দেশীয় তাঁতিরা তাঁতে বুনে কাপড় গামছা তৈরি করতেন। আর কর্মকারেরা নানান লোহার যন্ত্র সাজসরঞ্জাম তৈরি করত। পরবর্তীকালে ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব ও ইংরেজ রাজত্বের সূচনাতে দেশি তাঁতশিল্প ও দেশীয় ধাতুশিল্প ভীষণভাবে মার খেল। বাংলাদেশে আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, ওই সময় সকলেই কম বেশি নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরেন। ভাদ্র সংক্রান্তির পূর্বেই মোটামুটি আবার বোনার কাজ শেষ। তাঁতিদের এখন তাঁতঘর পরিষ্কার করবার সময়। ছেলেরা যেমন তাঁতঘর পরিষ্কার বা মেরামতিতে ব্যস্ত তেমনি স্ত্রীলোকেরাও রান্না না করে সকলে ওই কর্মে ব্যস্ত, ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা। পুজোয় যেমন আনন্দ আছে, তেমনি ঘুড়ি ওড়ানো প্রভৃতিও আছে। আনন্দ করতে হলে সকলেই একসঙ্গে করুক। কিন্তু যদি মেয়েরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকে তবে ওই আনন্দ উৎসব সমভাবে উপভোগ্য হয় না। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র তাঁতি ও কর্মকার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অরন্ধন বিশেষভাবে পালনীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে এক ব্যতিক্রমী অরন্ধনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। ওইদিন দুঃখ প্রকাশের জন্য উপবাস ও ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাখীবন্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আরো কিছুদিন অরন্ধনের প্রথা প্রচলিত আছে।■

পুথির চিত্রিত পাটা

চূড়ামণি হাটি

শুধু পুথির পাটা নয়; পুথিও চিত্রিত হয়েছে। ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পাল রাজা প্রথম মহীপালের সময় বারোটি রঙিন চিত্র নিয়ে রচিত হয়েছে বৌদ্ধ গ্রন্থ 'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথিটি। মূলত বৌদ্ধ পুথিগুলির চিত্রের বিষয় হতো মহাযান বৌদ্ধ দেবদেবীর ধ্যানমূর্তি। পুথির পাতার দু-পাশ কিংবা মধ্যে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য ভূমি নির্দিষ্ট। পুথির আবরণ; কাঠের পাটার ভূমি স্বাভাবিক ভাবেই পুথির পাতার সম্পূর্ণ আয়তন। পাটাগুলি ১৩-৫ ইঞ্চি থেকে ১৬-৪ ইঞ্চির কাছাকাছি। কিছু ক্ষেত্রে খোদাই করা চিত্ররূপ, আর কিছু ক্ষেত্রে রঙিন চিত্ররূপ নিয়ে সেজে ওঠে পুথির পাটা। সূত্রধরদের

হাতেই মূলত এর প্রকাশ। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা আগ্রহ না দেখালেও আচার্য ব্রাহ্মণেরা পুথি এবং পাটা চিত্রে ঝোঁক দেখিয়েছেন। বলাবাহুল্য পুথি চিত্রে রেখার সূক্ষ্মতা উন্নত শিল্পচর্চার পরিচয় দেয়। কিন্তু পাটাচিত্র তুলনামূলক ভাবে উন্নত মনের সৃষ্টি। নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পীর কাছে জীবন-জীবিকার মাধ্যম। কখনো একপিঠ; কখনো দু'পিঠই চিত্রিত। অর্থাৎ দুই থেকে চারটি প্রচ্ছদ। চিত্রের বিষয় লৌকিক চর্চাশ্রিত রামকাহিনি, কৃষ্ণ-কথা, গৌরাঙ্গের জীবন, বিষ্ণু ও শাক্ত দেবদেবী। লোকায়ত শিল্পীর ভাবনা।

ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা দীক্ষা এসব দিক দিয়ে বৃহৎ গ্রামীণ সমাজ পিছিয়ে ছিল না। নানা শিল্পকর্মের বিষয় ভাবনা থেকেই তা স্পষ্ট। তালপাতা ও তুলট কাগজের পুঁথির স্থায়িত্ব বাড়াতে দু'প্রান্তের দুটি পাটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শিল্পীমন তাকে খোদাই-রেখা; কিংবা রঙীন রেখা-রঙে অন্য রূপ দিল। পুথির একঘেয়েমি দূর করতে এবং আকর্ষণ বাড়াতে চিত্রিত পাটাগুলির তুলনা হয় না। বিষ্ণুর অনন্তশয্যা মূর্তি, বিষ্ণুর দশাবতার, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, কৃষ্ণের রাসলীলা, তাম্বুল লীলা, গোষ্ঠলীলা, ষাঁড়ের পিঠে শিব-দুর্গা, সংকীর্তন, নিমাই সন্ন্যাস, দশমহাবিদ্যা দৃশ্যগুলিই বেশি করে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা-জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক সংগ্রাহকদের কাছে পুথির কথা ও পাটার ছবি; দুই ছিল আকর্ষণের বিষয়। 'কপিলা মঙ্গল', 'গোপিকার বস্ত্রহরণ' এ ধরনের পুথিগুলির যেমন আকর্ষণ; তেমনি চিত্রিত পুথি পাটারও আকর্ষণ ছিল। পুথি দু' প্রান্তের পাটার চাপে যত্নে থাকতো। কবি রচিত পুথির লিপিকাররা নকল করতেন নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নিয়ে। আর নিম, কাঁঠাল, শাল-সেগুন কাঠের পাটাটি রঙিন হতো লোকায়ত শিল্পীর ছোঁয়ায়। পাটার উপর গালার আস্তরণ চাপিয়ে বার্ণিশ করা কিংবা চুনের প্রলেপ চাপিয়ে রঙিন করা কিংবা তেঁতুলবীজের আঠা দিয়ে শক্ত কাপড় টান-টান করে সেঁটে চিত্র-রূপ ফুটিয়ে তোলার উপযোগী করে পাটার ভূমি প্রস্তুত হতো।

তালপাতার পুথির ক্ষেত্রে মূলত স্ত্রী-তালগাছের পাতা বেশ কিছুদিন জলে ডুবিয়ে রেখে শঙ্খ দিয়ে ঘাম মসৃণ করে; আতপ চাল পোড়া কিংবা ভুসোকালি দিয়ে লেখার উপযোগী করা হতো। তুলো, বেলের আঠা, ভাতের ফ্যান দিয়ে প্রস্তুত হতো তুলট কাগজ। পুঁথির জগতে ভূর্জ গাছের ছাল সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। কয়েক বছর আগেও সরস্বতী পুজোয় খাগের কলমেই হাতেখড়ি হতো। যাইহোক, ত্রয়োদশ শতকে এক একটি পুথির দাম ছিল দুই থেকে পাঁচ আনা। বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রবর্তনের অনেক পরে প্রতিবাদী ভাবনা নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাহিত্যে রামায়ণ- মহাভারত, মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি বেশি গুরুত্ব পেল কৃষ্ণলীলা এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যলীলা। একই সঙ্গে সাহিত্য- সংস্কৃতিতে পড়েছে বিদেশি আগমন ও রাজশক্তির প্রভাব। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে আকবরের নির্দেশে রাজস্থানের জয়পুরের রাজা মানসিংহ বাংলা-বিহারের সুবেদার হওয়ার ফলে; রাজস্থানী ও পাহাড়ি মুঘল-রাজপুত চিত্রের প্রভাব পড়েছিল পুথির পাটার চিত্রশৈলীতে। মূলত সপ্তদশ শতক থেকেই বাংলার পার্শ্ববর্তী ওড়িশার শিল্পশৈলী প্রভাবিত করেছিল জগন্নাথের অবেগকে ভর করে। কথিত আছে নিজের বিরহকথায় দগ্ধ কৃষ্ণের রূপই হলো জগন্নাথ। পাশাপাশি নীলাধবের অসমাপ্ত দারুবিগ্রহের পেছনে রাজার শর্তভঙ্গ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি স্মরণে আসে। বাংলায় তখন কৃষ্ণ-আবেগ। সে যাইহোক, সমস্ত আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের লোকায়ত শিল্পীরা নিজের মতো করেও তৈরি করেছিল বেশ কিছু পুথির পাটা। লতা-পাতা কিংবা জ্যামিতির নক্সা বন্ধনীর মধ্যে ফুটে উঠতো চিত্ররূপ। বই-এর প্রচ্ছদ ভাবনা নিয়ে সাহিত্যিক, সম্পাদক ও প্রকাশকের উত্তেজনা সেদিনের মতো আজও রয়েছে। কিন্তু গঠনগত পার্থক্য ঘটেছে। প্রচ্ছদে পাঠক সমাজেরও দৃষ্টি আছে। হারিয়ে যাওয়া কাঠের প্রচ্ছদগুলি দেখতে হলে জাদুঘরগুলিতে উঁকি মারা ছাড়া উপায় নেই। পারিবারিক সূত্রে কারোর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলে তিনি খুব ভাগ্যবান। পুঁথির সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই হারিয়ে গেছে এ শিল্পচর্চা। ■

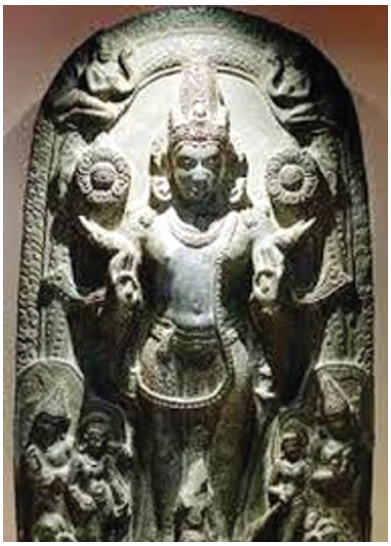

বৈদিক দেবতা পূষা

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বর্তমান দিনের বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, যে পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাকে পুষ্টি বলে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ঋষিগণের অনুভূতিলব্ধ পরম জ্ঞান, যে জ্ঞান ছিল এক অলৌকিক অখণ্ড জ্ঞানরাশি এবং যা ছিল সেই সময়ের ঋষিগণের স্বচ্ছ হৃদয় থেকে উদ্ভাসিত এক পরম জ্ঞানের সমাবেশ, তাই-ই হলো বেদ। 'বেদ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'জ্ঞান', জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে 'বেদ' শব্দের উৎপত্তি। বেদকে নির্ভর করে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক সুপ্রাচীন সম্পূর্ণ যুগের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই যুগ হলো বৈদিক যুগ। এই বৈদিক যুগ কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক সুপ্রাচীন যুগ।

ঋগ্বেদের সৌরদেবতাদের মধ্যে পূষা দেবতা হলেন অন্যতম। পূষ্ ধাতু থেকে পোষণ অর্থে 'পূষা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুপ্রাচীন বৈদিককাল থেকেই ভারতীয় ঋষিগণ মনে করতেন সূর্যই মানুষের পুষ্টিবিধায়ক। বর্তমান দিনের বিজ্ঞানের চিন্তাধারার থেকে বৈদিক যুগের ঋষিদের চিন্তাধারা অনেক উন্নত ছিল। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান পুষ্টিকে শরীরের বৃদ্ধি-ক্ষয়পূরণ-রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার এক পদ্ধতি বলে ভাবে। বৈদিক ঋষিগণ পুষ্টি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ভাবনাগুলি তো অবশ্যই ভেবেছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবনীশক্তি, পশুপক্ষী-সহ সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, ধনধান্য এবং পশু সংরক্ষণ, মানুষের জীবনের এবং পশু-সহ জীবজগতের জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শ্রেণীর সম্পদকে অর্থাৎ জলসম্পদ, ভূমিসম্পদ, বায়ুসম্পদ, তেজসম্পদ, অরণ্য সম্পদ ইত্যাদি সকল সম্পদের পুষ্টি, সংরক্ষণ এবং বিনষ্ট দ্রব্যের উদ্ধারকারক রূপে পুষ্টিকে মান্যতা দিয়ে তাকে প্রতিদিনের কর্মযজ্ঞে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টাকে প্রার্থনায় রূপান্তরিত করতেন পূষা দেবতার কাছে।

ঋগ্বেদের মোট আটটি সূক্তে সম্পূর্ণভাবে পূষা দেবতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার থেকেও উন্নত কর্মকাণ্ড চিরন্তন ভাবে সক্রিয় ছিল প্রাচীন অভীপ্সাকে বিস্মৃত না করে, হিংসা না করে, সহ্যক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে এবং ক্ষমাকে স্মরণে রেখে পোষণ-কর্ম সাধনায় এগিয়ে যাওয়াই ছিল সে যুগের ঋষিদের একমাত্র চিন্তা। কৃষি-পশুপালন, পশু এবং কৃষি সংরক্ষণ- সমস্তরকমে ধন নষ্ট না করা এবং নষ্টধনের পুনঃপ্রাপ্তির ইচ্ছা, চোর- ডাকাতের থেকে সমস্ত সম্পদ রক্ষা করা, হিংস্র পশুদের থেকে পশুপক্ষীদের রক্ষা, মানুষকে রক্ষা ইত্যাদি ঋগ্বেদের আটটি সূক্তের মাধ্যমে পূষা দেবতার কাছে ব্যক্ত করেছেন।

বৈদিক যুগের ঋষিগণ সব সময় সাধনাকালে পূষা দেবতাকে পথ প্রদর্শক রূপে আহ্বান করেছেন, বিচক্ষণ ব্যক্তির (যিনি পোষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন, এমনকী মৃত ব্যক্তির আত্মার দায়িত্বও পূষা দেবতার কাছে দিয়েছেন; পূষা দেবতাই যেন মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকের পথে নিয়ে যান। অর্থাৎ তাঁদের সাধনা সব সময় বাস্তব পথে হেঁটে মানুষের মধ্যে বিচক্ষণতা বৃদ্ধি করে, 'বিচক্ষণ ব্যক্তি' তৈরির লক্ষ্যে ছিল।

বৈদিক যুগ থেকে পূষা দেবতার প্রতি যে স্তুতি তা কিন্তু আজ আমাদের জীবনের নানা কার্যে প্রতিফলিত করার সময় এসে গেছে। আজ জীবনের-সমাজের-রাষ্ট্রের-বিশ্বের পুষ্টির ভীষণ অভাব, সংরক্ষণ, দূষণ ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে যে যা কাজেই নিযুক্ত থাকি না কেন, তা সুন্দরভাবে সফল করে তুলতে পারলেই সামগ্রিকভাবে যথার্থ পুষ্টিলাভ করা যাবে। সবকিছু বিনষ্ট করে শুধুমাত্র নিজের পুষ্টিলাভের চিন্তায় পুষ্টি কখনওই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। বিশ্ব রক্ষার্থে বৈদিক ঋষিগণের দেখানো পথে পূষা দেবতাকে আমাদের হৃদয়ের আসনে রেখে বিশ্বসংসারের পুষ্টিলাভের কর্মযজ্ঞে চলতে হবে, তবেই আমরা যথার্থভাবে পুষ্টিলাভ করে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারব। ■

ঋকের স্বপ্ন আন্তর্জাতিক পদক

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋক রায় সব অর্থেই যেন অনন্যা। মাঠে তিরন্দাজির ক্ষেত্রে ধ্রুপদী গায়িকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রির জন্য মেধাবী ছাত্রী। আর হবেই বা না কেন। মা রুমা রায় যে প্রাক্তন ভারতীয় তিরন্দাজ, বর্তমানে ভারতীয় মহিলা দলের কোচ। বাবা কেতকীপ্রসাদ রায় প্রতিষ্ঠিত লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করেন। এহেন সুকৃতী বাবা-মার জিনের উত্তরাধিকার বহন করছে যে মেয়ে সে সবদিক থেকেই যে স্বতন্ত্র হবে, তা বলাই বাহুল্য। স্বস্তিকার সামনেও যথেষ্ট সপ্রতিভ এবং অকপট ঋক।

প্রশ্ন : তিরন্দাজি এবং সঙ্গীতে আসার প্রেক্ষাপটটি কী?

ঋক : ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় মা একদিন সঙ্গে করে সল্টলেক সাইকেন্দ্রে নিয়ে যান। সাইয়ের মনোরম পরিমণ্ডল, নানা বয়সের তিরন্দাজদের একনিষ্ঠ সাধনায় রত দেখে মাঠ এবং খেলাটির প্রেমে পড়ে যাই। মা যেহেতু দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে এশিয় ও বিশ্বস্তরে তাই বাড়তি তাগিদ ও অনুপ্রেরণা ভিতর থেকে এসেছিল। আর সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা আরো কম বয়স থেকে। টিভি, রেডিও, ক্যাসেটে সব ধরনের গান শুনতাম। গলায় সুর-তাল ছিল মোটামুটি। তাই পরিশীলিত রেওয়াজ করে নিজেকে মেলে ধরতে পারছি। সব ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডাকও পাচ্ছি।

প্রশ্ন : রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পারফরমেন্সের কথা বলুন?

ঋক : ১২/১৩ বছর বয়স থেকে সকাল, বিকেল দুবেলা অনুশীলনের ফল পাচ্ছি হাতে নাতে। সাব জুনিয়র, জুনিয়র স্তরে বহুবার রাজ্য স্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। কয়েকবছর আগে দীঘায় রাজ্য বিচ ফেস্টিভ্যালে 'কম্পাউন্ড' ইভেন্টে দর্শকদের তাক লাকিয়ে খেতাব জিতেছিলাম। আর জাতীয় স্তরেও মোটামুটি উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স মেলে ধরেছি। দু'বছরে আগে কেরলে জাতীয় গেমসে বাছাইপর্ব থেকে যোগ্যতা অর্জন করে মূলপর্বে খেলেছিলাম। এরপর জাতীয় সিনিয়র মিটে একই ফল হয়েছে।

প্রশ্ন : কী কী স্বীকৃতি বা পুরস্কার পেয়েছেন?

ঋক : ২০১৫ সালে অল ইন্ডিয়া এডিটরস অ্যান্ড জার্নালিস্ট গিল্ডের তরফে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিলাম। তারপর টেলিগ্রাফের টিটিআই পুরস্কার প্রাপ্তিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিরন্দাজি এবং সঙ্গীত মিলিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার আমার ক্যাবিনেটে শোভা পাচ্ছে।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক পদক জিততে কী করণীয়?

ঋক : ভারতবর্ষের তিরন্দাজরা এখন আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট ভাল পারফরমেন্স করছে। ঘন ঘন বিশ্ব কাপ হচ্ছে এখন। ভারতের দোলা ব্যানার্জি, দীপিকা কুমারীরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে মঙ্গল সিংহ চ্যাম্পিয়ন, তরুণদীপরাই এশিয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমি সাইয়ের মাঠে এইসব খ্যাতকীর্তি তিরন্দাজদের সঙ্গে দুবেলা অনুশীলন করে নিজেকে একটা জায়গায় তুলে আনতে পেরেছি। ফিটনেস, টেকনিক্যাল স্কিল, রিফ্লেক্স সবকিছুই বাড়িয়ে নিতে পেরেছি। সামনের বছর কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস আছে। আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে ভারতীয় দলে ঢুকতে পারি। বিশ্বস্তরে না হোক, এশিয়স্তরে পদক জিততে চাই। নিজের খেলাকে আরো পরিশীলিত করতে হবে তারজন্য।

প্রশ্ন : দেশের বনবাসীস্তরে অসংখ্য প্রতিভা আছে। ভবিষ্যতে তাদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে কি?

ঋক : আমার মা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। যখন সেখান থেকে ডাক আসে মা ছুটে যান। এখন যেসব বনবাসী তিরন্দাজ সাইতে অনুশীলন করছে, তারা প্রায় সবাই কল্যাণ আশ্রমের তিরন্দাজি প্রকল্প ও প্রতিযোগিতা থেকে উঠে এসেছে মায়ের তত্ত্বাবধানে। এখন তারা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে সাইয়ে। মা ছাড়াও সব ভারত সেরা কোচেরা আছে এখানে। আন্তর্জাতিক তিরন্দাজদের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করছে। আমি খেলা ছাড়ার পর যদি সক্রিয় কোচিংয়ে আসি তাহলে অগ্রাধিকার দেব বনবাসী সম্প্রদায়কে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের পটভূমি

মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করতে করতে স্বামীজী পন্ডিচেরি থেকে মাদ্রাজের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মাদ্রাজে এলেন। পৃথিবীর সব ধর্মসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এক ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে— এরূপ সংবাদ ওই এলাকায় প্রচারিত হয়েছিল। এ সংবাদ স্বামীজী জানতেন। স্বামীজীর কয়েকজন উৎসাহী শিষ্যের আগ্রহ তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বের প্রথম ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করতে হবে। ভক্তরা কিছু অর্থও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করে ফেললেন। কিন্তু তখনও স্বামীজী অন্তর থেকে কোনো সাড়া পাননি। তাই তিনি ভক্তবৃন্দের উদ্দেশে বললেন— 'আমি হচ্ছি জগন্মাতার হস্তের যন্ত্রমাত্র। তাঁর একান্ত ইচ্ছা হলেই তিনি আমাকে সেখানে পাঠাবেন। আপাতত এই অর্থ তোমরা দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বিলিয়ে দাও।' স্বামীজীর এই নির্দেশ তারা লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে হায়দরাবাদে এলেন। স্টেশনে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে সেকেন্দ্রাবাদ ও হায়দরাবাদের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হায়দরাবাদে এক জনসভায় স্বামীজী বলেন— 'বেদান্তের মর্মবাণী অনুসরণের মাধ্যমেই পৃথিবীতে ধর্মসমন্বয় সম্ভব। তাই পৃথিবীর সভ্যমানুষের কাছে বেদান্তের আদর্শ প্রচার করা একান্ত আবশ্যক।' পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী প্রচারের জন্য হায়দরাবাদের নিজাম স্বামীজীকে এক হাজার টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীজী বিনীতভাবে তা

জর্জ হেল

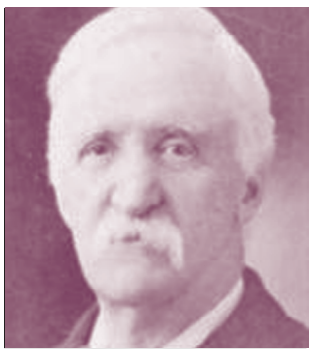

জে. বি. লিয়ন

প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন--- 'ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া আপাতত তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সে আদেশের প্রতীক্ষায় আছেন।'

স্বামীজী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে হায়দরাবাদ থেকে আবার মাদ্রাজে ফিরে এলেন। তাঁর শিষ্যসামন্তরা তাঁকে ধর্মসম্মেলনে পাঠানোর জন্য মহীশূর, রামনাদ, পণ্ডিচেরি, ব্যাঙ্গালোর এবং ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত শহরেও অর্থ সংগ্রহের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। জাস্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আনন্দকার্লু, মাদ্রাজের তরুণ শিক্ষক তথা বিশিষ্ট শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও স্বামীজীকে শিকাগোর ধর্মসম্মেলনে পাঠাতে খুবই উৎসাহী ছিলেন। স্বামীজী এবার তাদের বাধা দিলেন না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে— অন্তরে তিনি এটা উপলব্ধি করলেন। প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ডেকে বললেন— 'আমেরিকা ধর্ম-মহাসভায় যাওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত হলে আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু আমাকে বুঝে নিতে হবে যে, এই ব্যাপারে ভারতের সাধারণ মানুষের অনুমতি আছে কিনা। তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে যাও, তাদের থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে দেখ, তাতে কী রকম সাড়া পাওয়া যায়।' অনুমতি পেয়ে শিষ্যগণ অতি উৎসাহের সঙ্গে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই সময়ে একদিন হঠাৎ স্বামীজীর ঘুম ভেঙে যায় এবং এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে। দেখলেন, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সামনে উপস্থিত। তিনি যেন এক বিশাল জ্যোতিপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র উপকূল থেকে বিশাল সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে চলে আসার জন্য ঠাকুর স্বামীজীকে ইঙ্গিত করছেন। কিছুক্ষণ পর রামকৃষ্ণদেব জ্যোতিপুঞ্জের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস হলো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আমেরিকা যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। শ্রীশ্রীমা সারদামণির অনুমতি এবং আশীর্বাদ কামনা করে একখানা পত্র পাঠালেন। নরেন শ্রীশ্রীমায়ের বড় আদরের সন্তান। বিদেশে পাঠাতে তাঁর শঙ্কা হচ্ছে, ভয় হচ্ছে; তারপর রয়েছে তখনকার সমাজের বিভিন্ন ধরনের অন্ধ কুসংস্কার। বহু ভাবনাচিন্তার পর তিনি নরেনকে বিদেশে যাওয়ার জন্য আশীর্বাদপূর্ণ অনুমতিপত্র পাঠালেন। স্বামীজী পত্রখানি মাথায় নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের মধ্যে নৃত্য শুরু করে দিলেন। তারপর মন্মথবাবুর বাড়িতে এসে দেখেন সেখানে অগণিত ভক্ত তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছেন। সেখানে স্বামীজী আনন্দে চিৎকার

করে বলে উঠলেন— ''আমি শ্রীমায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি, পেয়েছি তাঁর অনুমতি। আমি আমেরিকার ধর্মসভায় যাব। মায়ের আদেশ পেয়েছি যখন, আমার আর চিন্তা কি?'' খেতড়ির রাজা স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার জন্য জাহাজের টিকিট কেটে দিলেন। স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠানোর পরিকল্পনা রামনাদের রাজা ভাস্করবর্মা সেতুপতির মনে প্রথম উদিত হয়। ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি বার বার স্বামীজীকে উৎসাহিত করেছিলেন।

খেতড়ির মহারাজা মঙ্গল সিংহের দেওয়া 'বিবেকানন্দ' নাম নিয়ে স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে 'পেনিনসুলার' জাহাজে করে বোম্বাই থেকে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। মুন্সি জগমোহনলাল, আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং আরও কয়েকজন মাত্র ভক্ত বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় স্বামীজীকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বাই থেকে প্রার্থনা সমাজের প্রতিনিধিরূপে গিয়েছিলেন বি.বি. নাগরকর, কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ প্রতিনিধি অনাগরিক ধর্মপাল, কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, এলাহাবাদের জ্ঞানেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, মণিলাল দ্বিবেদী প্রমুখ।

এই সকল বিশিষ্ট গণ্যমান্য প্রতিনিধিদের স্বাগত-অভ্যর্থনা জানাতে উভয় দেশের জাহাজঘাটেই সুবন্দোবস্তের কোনও অভাব ছিল না।

আর স্বামী বিবেকানন্দ? অনাহুত অজ্ঞাত পরিচয়হীন সেই সন্ন্যাসী? প্রায় দু'মাস পর মাঝে একবার জাহাজ পালটে তিনি 'এম্প্রেস অব ইন্ডিয়া' জাহাজে ২৫ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে সকলের অলক্ষ্যে উপস্থিত হন। ভ্যাঙ্কুভার থেকে দুবার ট্রেন পালটে এক দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার পর স্বামীজী ৩০ জুলাই রবিবার রাত এগারোটায় শিকাগোয় এসে উপস্থিত হন।

আমেরিকানরা পোশাক-আশাকে কেতাদুরস্ত। স্বামীজীর গৈরিক পোশাক আমেরিকাবাসীদের কাছে কিম্ভূতকিমাকার। কৌতূহলী জনতা তাঁকে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উত্যক্ত করতে লাগল। তাঁরা খাওয়া-দাওয়া ঘুম ঠিকমতো হচ্ছে না। শীতে খোলা জায়গায় থাকাও সম্ভব নয়। তাই তিনি একটি হোটেলে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু হোটেলের খরচ ছিল তাঁর ক্ষমতার বাইরে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি হলো তিনি ধর্মমহাসভা সম্পর্কে খোঁজখবরাদি নিয়ে জানতে পারলেন— ধর্মমহাসভা শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। যেসব প্রতিনিধি যোগ দিতে চান তাদের প্রত্যেকের পরিচয়পত্র চাই। নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাউকে মহাসম্মেলনে বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। আবার প্রতিনিধির নাম পাঠানোর শেষ দিনটি অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে— এখন আর আবেদন করার সময়ও নেই। ক্লান্ত দেহ, বিষণ্ণ মন, তারপর এই দুঃসংবাদ। শিকাগোয় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তিনি 'ভেঙে পড়লেন না। শিকাগো ধর্মমহাসভার ব্যবস্থা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচারের জন্যই করা হয়েছে—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস স্বামীজীর ছিল। কারণ আমেরিকা আসার পূর্বে স্বামীজী একবার তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন--- ''জানতো হরিভাই, ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে) জন্য হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শীগগিরই এর প্রমাণ দেখতে পাবে।''

শিকাগোয় স্বামীজী নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রায় বারো দিন কাটালেন, সেই সময় বিশ্বমেলায় তিনি পৃথিবীর বিভিন্নদেশের শিল্প সৃষ্টি ও কলাকৌশল দেখে রোজই নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আমেরিকার পূর্ব উপকূল বস্টন শহরে কম খরচে থাকার সুবিধা আছে জেনে তিনি বস্টন অভিমুখে যাত্রা করলেন এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে। যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন লালুভাই।

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় অস্থির স্বামী বিবেকানন্দ যখন একেবারে নিরুপায় হয়ে ট্রেনে বস্টন যাচ্ছিলেন, তখন নেপথ্যে সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছিলেন। ট্রেনে যেতে যেতে আকস্মিকভাবে এক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। স্বামীজীর গৈরিক আলখাল্লা দেখে মহিলাটি বিশেষ কৌতূহলী হয়ে স্বামীজীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী জানালেন, তিনি সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় এসেছেন। তিনি এখানে ভারতের বেদান্ত-ধর্মপ্রচার করতে চান। স্বামীজীর তেজোদীপ্ত, পবিত্র দিব্য চেহারা দেখে এবং তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করে মহিলাটি বুঝতে পারলেন যে স্বামীজী একজন সুশিক্ষিত ভারতীয় সন্ন্যাসী এবং তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগাদন করতে এসেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে মহিলাটি স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি স্বামীজীকে বস্টনে নিজের পল্লী বাটী ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের 'ব্রিজি মিডোসে' নিয়ে যান। এই মহিলার নাম মিস ক্যাথেরিন স্যানবর্ন।

স্বামীজী আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বস্টনে থাকাকালীন মিস স্যানবর্নের সূত্রে বিভিন্ন ক্লাব, গির্জা ও সভায় বক্তৃতা করে স্বামীজী সেখানকার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। বস্টনে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর খবর বের হতে লাগল।

বস্টনে স্যানবর্ন ভাই-বোনদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচিত হওয়া যেন একটি দৈবী ঘটনা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার খ্যাতনামা অধ্যাপক জন হেনরি রাইট ২৪ আগস্ট তাঁর অ্যানিস্কোয়াম গ্রাম থেকে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করতে বস্টনে এসেছেন। বস্টন থেকে গ্রামটি প্রায় ৫০ কিমি উত্তরপূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। কিন্তু স্বামীজী সেদিন অন্যত্র যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী অধ্যাপক রাইটের স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার খুবই আগ্রহ ছিল। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচ্য দর্শনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে অতিথি হয়ে কয়েকদিন থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে ফিরে যান। তারপর এক শুক্রবার স্বামীজী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অধ্যাপক রাইটের বাড়িতে হাজির হন।

স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলে অধ্যাপক রাইট জানতে পারলেন তিনি ধর্মসভায় যোগ দিতেই শিকাগোতে এসেছেন। অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর সব অসুবিধার কথা জেনে স্বামীজীকে বললেন— ''আমেরিকার সমস্ত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য

ধর্মমহাসভায় যোগদান করাই আপনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সুযোগ।'' স্বামীজী সঙ্গে কোনো পরিচয়পত্র আনেননি শুনে অধ্যাপক রাইট গভীর আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন— ''To ask you like,/ Swami, for your credentials is like asking the Sun to state its right to shine !" —স্বামীজী, আপনার পরিচয়পত্র চাওয়ার মানে হচ্ছে, সূর্যকে জিজ্ঞেস করা— কী অধিকারে সে কিরণ দিচ্ছে। কিন্তু রাটইট এ কথা বললে কী হবে? স্বামীজীর গুণেরসঙ্গে সকলে তো পরিচিত নন। তাই তাঁর একটা পরিচয়পত্র চাই-ই-চাই।

অধ্যাপক রাইট খুব খ্যাতনামা এবং আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বামীজীকে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের সব ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। তিনি তখনই মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচক কমিটির সচিব ড. ব্যারোজকে একখানা চিঠি লিখলেন— ''দেখলুম, এই অজ্ঞাত হিন্দু সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য আমাদের দেশের সব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য একত্র করলে যা দাঁড়াবে, তার চেয়েও বেশি।'' অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি শিকাগো পর্যন্ত একটা রেলের টিকিটও কেটে দিলেন এবং শিকাগোয় গিয়ে যাতে স্বামীজীর কোনো অসুবিধা না হয়, তাই তাঁকে কিছু টাকাও দিলেন। প্রাচ্য প্রতিনিধিদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থায় নিযুক্ত মহাসভার কমিটির নামেও একটা পত্র লিখেছিলেন। স্বামীজী বুকের গভীরে ফিরে পেলেন প্রচুর আত্মবিশ্বাস। অধ্যাপক রাইটের চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হলো। ধর্মমহাসভার রুদ্ধদ্বার অপ্রত্যাশিতভাবেই স্বামীজীর কাছে খুলে গেল।

তিন সপ্তাহ বস্টনে থেকে স্যানবর্ন ভাই-বোন ও অধ্যাপক রাইটের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য ও উৎসাহ নিয়ে স্বামীজী আবার ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশে শিকাগো রওনা হলেন। ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী শিকাগোয় পৌঁছান। শিকাগোয় পৌঁছে স্বামীজী বহু বিপদের সম্মুখীন হন। পকেটে হাত দিয়ে দেখেন ব্যারোজের ঠিকানাটি হারিয়ে ফেলেছেন। রেলে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। তিনি স্বামীজীকে ড. ব্যারোজের ঠিকানায় পৌঁছে দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু স্টেশনে নেমেই ওই ভদ্রলোক ব্যস্ততার সঙ্গে চলে যান। নিগ্রো ভেবে সবাই তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল— কোনো হোটেলে তাঁর থাকা হলো না। শীতের রাতে আশ্রয় নেবার মতো কোনো জায়গা খুঁজে না পেয়ে স্টেশনে পরিত্যক্ত একটি খালি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে রাতের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলেন। হায় ঠাকুর, মাত্র দুদিন পরে তোমার যে প্রিয় শিষ্যটির তেজস্বিতাপূর্ণ কম্বুকণ্ঠ সমস্ত আমেরিকাকে উথাল পাথাল করে দেবে, মাত্র দুদিন আগে সেই মানুষটাই সবার অলক্ষ্যে একান্ত নিরুপায় হয়ে শীতের হাত থেকে বাঁচতে এভাবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন? সন্ন্যাসী স্বামীজীর এ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। যারা স্বামীজীকে নিগ্রো মনে করে ঘৃণা করল, সেখানে তিনি একবারও বলেননি যে, তিনি নিগ্রো নন।

এ প্রসঙ্গে জনৈক শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন— ''অপরকে ছোট করে আমি বড় হব? আমি তো পৃথিবীতে সেজন্য আসিনি।'' বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের নামই বিবেকানন্দ।

ভোরে উঠে স্বামীজী চিন্তা করতে লাগলেন, তিনি ড. ব্যারোজকে এতবড় শহরে কী করে খুঁজে বার করবেন। ওই অঞ্চলের লোকেরা ছিল জার্মানভাষী। তারা ইংরেজি জানত না। সকলেই যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল। ভারতের মতো এখানেও তিনি ভিক্ষে করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এখানে ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীকে কেউ ভিক্ষা দেয় না। কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল, কেউ গালাগাল দিল, কেউ বা বন্দুক দেখাল, কেউ এই কালো আদমি নিয়ে হাসি ঠাট্টাও শুরু করে দিল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় তিনি একেবারে কাতর হয়ে পড়লেন। পথ চলার ক্ষমতাও যখন ছিল না, নিরুপায় হয়ে পথের পাশেই বসে পড়লেন, ভাবলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের যা ইচ্ছা তাই হবে। ঈশ্বরও যেন ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু শীঘ্রই পরীক্ষার কাল শেষ হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্য যখন পথের উপর ক্লান্ত হয়ে অচেতন অবস্থায় শায়িত তখনই ঠিক তার সামনের বড় বাড়িটার দরজা খুলে গেল। স্বয়ং করুণাময়ী ভগবতী হয়ে একজন মহিলা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মধুর বচনে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন— ''মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি?'' স্বামীজীর সমস্ত সমস্যার উত্তর দেবদূতী মাতৃসমা মহিলার প্রশ্নের মধ্যেই ছিল। স্বামীজী তাঁর অবস্থার কথা সব খুলে বললেন। সেই মহিলা সসম্মানে স্বামীজীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর থাকা খাওয়া সেবার সুব্যবস্থা করলেন। ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মহিলার পরিচয় ছিল। তিনি বিকেলে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে স্বামীজীকে নিয়ে যান। এই মাতৃহৃদয় মহিলার নাম শ্রীমতী জর্জ ডব্লিউ হেল। শ্রীযুক্ত হেল ও শ্রীযুক্তা হেল খুব উদার ধর্মপরায়ণ ছিলেন। এঁদের স্বামীজী 'ফাদার পোপ' ও 'মাদার চার্চ'' বলে আদর করে ডাকতেন ও সম্মান করতেন। এই হেল পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর সুসম্পর্ক ছিল।

শ্রীযুক্তা হেলের অযাচিত বদান্যতায় এবং আন্তরিক সহযোগিতায় স্বামীজীর সব বাধা নিমেষে দূর হয়ে গেল। শ্রীযুক্তা হেলের উপস্থিতি এবং অধ্যাপক রাইটের দেওয়া চিঠি ধর্মমহাসভার কর্মকর্তাদের দেখানো মাত্র স্বামীজীকে বিনাবাক্য ব্যয়ে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা হলো। তারপর অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতো স্বামীজীরও ২২৬ নং মিশিগান অ্যাভেনিউয়ের মি. জে. বি. লায়নের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো। স্বামীজী শ্বেতাঙ্গ নন, তাই মি. লায়ন ভাবলেন তিনি থাকলে তাঁর শ্বেতাঙ্গ অতিথিদের অসুবিধে হতে পারে। ঠিক করলেন, বাড়িতে না রেখে স্বামীজীকে কোনো হোটেলে রাখবেন। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে দু'একটি কথা বলে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন— ''আমাদের সব অতিথিরা চলে গেলেও আমি কিছু মনে করব না; কিন্তু এই অতিথিটি যেন থেকে যায়। এই ভারতীয় আতিথির মতো এত প্রতিভাধর আকর্ষণীয় মানুষ আমাদের বাড়িতে আর কখনও আসেনি। যতদিন তাঁর ইচ্ছা হয় থাকবেন।'' ▮

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

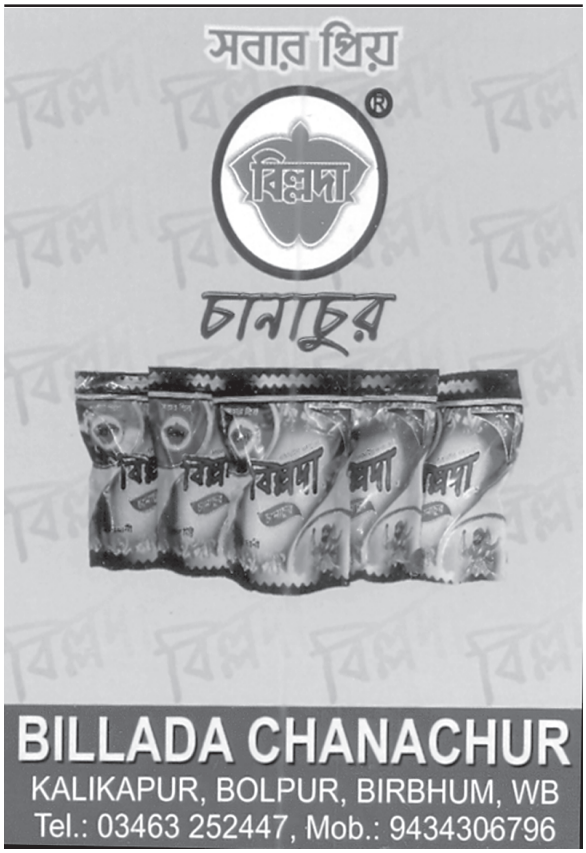

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

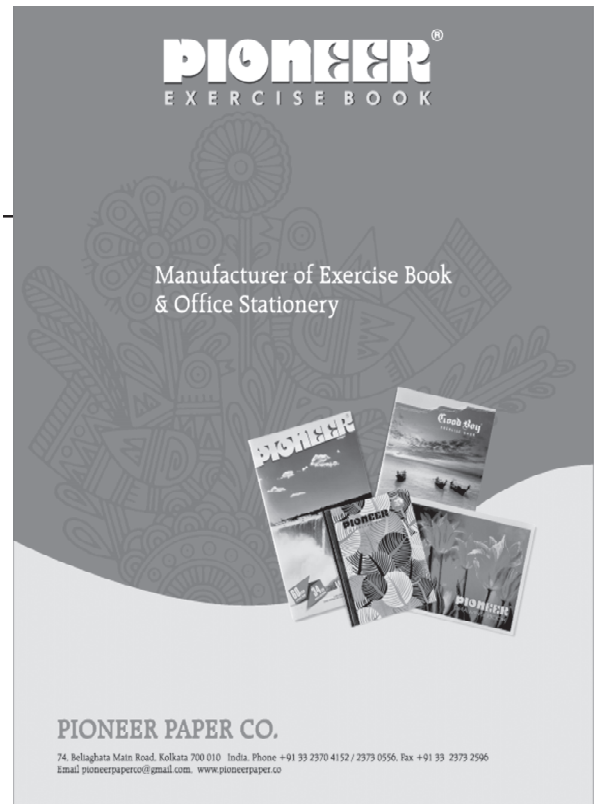

স্পন্ডিলাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

'স্পন্ডাইল' শব্দটি থেকে স্পন্ডিলাইটিস কথাটি এসেছে। এর ইরেজি প্রতিশব্দ হলো ভার্টিব্রা। যার বাংলা অর্থ কশেরুকা। বিভিন্ন কারণে মেরুদণ্ডের ভার্টিব্রার জয়েন্টে ডিস্ক সরে যায়। এতে দুটি ভার্টিব্রা একে অপরের ওপরে চেপে বসে। ফলে মেরুদণ্ড-সন্নিহিত স্নায়ুতে পড়ে প্রবল চাপ। প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এই সমস্যা যে-কোনও বয়সে হতে পারে। একেই বলে স্পন্ডিলাইটিস।

● রোগের কারণ :

আধুনিক জীবনযাত্রার ধরন এবং সর্বক্ষেত্রে দূষণ এইসব রোগব্যাধির হার বাড়িয়ে তোলার অন্যতম কারণ। এছাড়া, একনাগাড়ে ঘাড় নিচু করে কাজ করা, অতিরিক্ত ভারী ওজন কাঁধে বহন করা কিংবা খুব মোটা বালিশে বা বালিশ ছাড়া শোওয়া, আঘাতজনিত অবস্থা, সামনে অতিরিক্ত ঝুঁকে কোনও ভারী জিনিস তোলা, ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে শোওয়া বা অতিরিক্ত নরম ও অসমান গদিতে শোওয়া, মেদবহুল ভারী চেহারা প্রভৃতি। তাছাড়া অন্যান্য কারণগুলি হলো শিরদাঁড়ার গঠনগত ত্রুটি, টিউমার, কিডনির অসুখ, বংশগত কারণ এই রোগের জন্য দায়ী।

● কাদের হয় :

সাধারণত ২০-৪৫ বছরের অল্পবয়সী ব্যক্তিদের বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

● প্রকারভেদ :

স্পন্ডিলাইটিস মেরুদণ্ডের যে-কোনও জায়গায় হতে পারে। এগুলি হলো, সারভাইকাল, থোরাসিক, লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস। অর্থাৎ এই অসুখ ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে হতে পারে। এছাড়াও আছে অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডিলাইটিস। এই সমস্যায় মেরুদণ্ড অনেকটা বাঁশের মতো দেখতে হয়। আর যে-কোনো ধরনের স্পন্ডিলাইটিসের প্রাথমিক লক্ষণ হলো ব্যথা।

● উপসর্গ :

এ রোগের প্রধান লক্ষণগুলি হলো—

১। ব্যথা, জয়েন্টগুলি শক্ত হয়ে যাওয়া এবং জয়েন্টগুলির বিকৃতি। প্রথম দিকে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট আক্রান্ত হয়।

২। ধীরে ধীরে উপরের দিকে বিভিন্ন জয়েন্টগুলি আক্রান্ত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্যাক্রোইলিয়াক, স্পাইনাল, হিপ ও সোলডার জয়েন্টগুলি আক্রান্ত হয়।

৩। স্পাইনাল জয়েন্ট ও অন্যান্য জয়েন্টগুলি শক্ত হয় এবং নড়াচড়া করা অসুবিধা হয়।

৪। স্পাইন ফ্লেকশানের ফলে রোগী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কস্টোভার্টিব্রাল জয়েন্টগুলি আক্রান্ত হওয়ার জন্য বুকের সম্প্রসারণ ক্ষমতা কমে যায় ও শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে।

৫। এই রোগ মৃত্যু আনে না ঠিকই, তবে যথেষ্ট বেদনাদায়ক। এই রোগের সঙ্গে আলসারেটিভ কোলাইটিস সংযুক্ত থাকে।

এর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধামান্দতা, অল্প জ্বর, দুর্বলতা ও ওজন কমে যেতে দেখা যায়।

● সাবধানতা :

১। শরীরের ওজন বেশি থাকলে কমাতে হবে।

২। শক্ত বিছানায় শুতে হবে।

৩। পেশাগত কারণে রোগ হলে, পেশার পরিবর্তন করতে হবে। তবে সবক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

● চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী রাসটক্স, হাইপেরিকাম, জেলসিমিয়াম, ব্রায়োনিয়া, ম্যাগফস, ক্যালিফস প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ নির্বাচন করেন, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। এর সঙ্গে চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী যোগব্যায়াম করতে হবে। এই রোগের জন্য মানসিক অবসাদ হলে কাউন্সেলিং করা টদরকার।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

সকাল বেলার বিলে

স্বামীজীর ছেলেবেলার নাম ছিল বিলে। পরে নরেন্দ্র। তাঁর আর দু' ভাইয়ের নাম— মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র। রাত্রিতে তিনভাই বিছানায় পাশাপাশি শুত তক্তপোষের ওপরে গদির বিছনায়। পাশে ভাই মহেন্দ্র। এমনকী ছোট বোন দিদিমা মা সকলেই একই বিছানার শরিক হয়ে থাকত। মহেন্দ্র দাদার গায়ে আলতো করে স্পর্শ করে বলত, 'ও-দাদা একটা গল্প বলো না।' বিলে অমনি পাশ ফিরে শুয়ে ভাইয়ের মুখোমুখি চেয়ে গল্প বলে যেত। —'তা হলে শোন, একটা গরিব বাগ্‌দি বুড়ির সম্বল বলতে ছিল একটা ছাগল। রোজ সকালে ছাগলটাকে চরাতে নিয়ে যায়। গাছের কচি পাতা জিভ দিয়ে টেনে ছাগলটা সারাদিন ধরে উদরস্থ করত। সন্ধ্যে হওয়ার আগে বাগ্‌দি বুড়ি ছাগলটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসত। একদিন দুষ্টু একটা লোক সেই ছাগলটাকে দেখে জিভের জল সামলে রাখতে পারল না। ছাগলটাকে চুরি করে সে কেটে খেয়ে ফেলে। বাগ্‌দি বুড়ি বিকেলে ছাগল আনতে গিয়ে চমকে উঠল। কোথায় তার ছাগল? এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেল না। মুখে চোখে উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠল। অগত্যা সেই দুষ্টু লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো আমার ছাগলটা কোথায়? সে বাগ্‌দি বুড়িকে বুঝিয়ে বলল, তোমার ছাগল আর ছাগল নেই। উদ্ধার হয়ে মানুষ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন অমুক জায়গায় কাজী হয়ে বিচার করছে। তাই নাকি? হ্যাঁ গো— দুষ্টু লোকটা উত্তর দিল। অগত্যা বাগ্‌দি বুড়ি তার হাতে দড়ি নিয়ে কাজির এজলাসের দরজায় হাজির। ছাগলটার থুতুনির তলায় যেমন একটু দাড়ি ছিল কাজীরও তেমন দাড়ি। ছাগলের রং মিশমিশে কালো। কাজীরও তেমনি। এমনকী চোখ দুটিও ছাগলের মতো আয়ত এবং কাজল কালো। বাগ্‌দী বুড়ির দৃঢ় ধারণা হলো তার অবলা পাঁঠা উদ্ধার হয়ে এখন কাজী হয়েছে। তাই সে দড়িটায়

ফাঁস লাগিয়ে দু-হাতে তুলে ধরে কাজীর দিকে দেখিয়ে বলল, 'অররর হিলি আয়, অররর হিলি আয়। কাজী তো এজলাস থেকে বুড়িকে দেখতে লাগল এবং তার কথা মন দিয়ে শুনল।

মুহূর্তের মধ্যে কী একটা বুদ্ধি খেলে গেল কাজীর মাথায়। তারপর চাপরাশিকে জিজ্ঞেস করল, ওই বুড়ি কেন বারবার ফাঁসের দড়ি দেখাচ্ছে আর বলছে, উ র র র-অ র র র্ হিলি আয়। ব্যাপারটা একটু দেখে এসো তো। চাপরাশি কুর্নিশ করে চলে গেল। বুড়ির সঙ্গে কথা বলতেই চাপরাশি চমকে উঠল। বুড়ি তখনও আপন মনে বলে চলেছে, কেন তোমার কাজীর আগের কথা মনে নেই? আজ না হয় কাজী হয়েছে, কিন্তু আমি তাকে এতদিন ধরে মাঠে চরালুম, ঘাসপাতা খাওয়ালুম, গায়ে কত হাত বোলালুম। বুকের কাছে নিয়ে আদর করলুম কতো। সব বেমালুম ভুলে গিয়ে এখন চাপরাশিকে জিজ্ঞেস করছে, 'দ্যাখ তো ও কী বলে।'

এদিকে চাপরাশি সব বুঝে উঠতে না পেরে বুড়ির কথা কাজীর সামনে গিয়ে উগরে দিল। মুহূর্তকাল চোখ বুজে তিনি কী ভাবলেন। তারপর এজলাস থেকে নেমে এলেন। বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি কী বলতে চাও? বুড়ি অমনি ছাগল ফিরে পাওয়ার আনন্দে ফাঁসওলা দড়িটা এক ঝটকায় কাজীর গলায় পরিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্ত টেনে ধরে বলল, অররর্ হিলি আয়, এদের বাড়ি থাকতে হবে না। তুই তোর নিজের বাড়ি চল, অনেক ঘাস পাতা জড়ো করে রেখেছি। কাজী তো অবাক। বলে কী! এজলাস ভর্তি লোকজন হইচই করে উঠল। পাগল ভেবে বুড়ির দিকে তেড়ে গেল কেউ। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। বুড়ি তখনও বলে চলে, তুই আমার পাঁঠা। 'অররর্ হিলি আয়। এখন মানুষ হয়ে কাজী হয়েছ, আবার মানুষেরই বিচার করছ। কিন্তু আগের কথা কি সব ভুলে গেছ? আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? তুই তো আমার সেই পাঁঠা। অমুক লোকে বলল তুই নাকি উদ্ধার হয়ে এখন মানুষ হয়েছিস— আবার কাজী হয়েছিস। ও-বাব্বা তাই নাকি? তা বাবা যাই হও— আমার কাছে সেই পাঁঠা হয়েই আছ। তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। শুনে তো কাজীর মাথা ঘুরে গেল। কিন্তু তিনি মূল জায়গার দিকে দৃষ্টি ফেললেন। বুঝতে পারলেন একটা দুষ্টু লোক পাঁঠাটাকে কেটে খেয়ে ফেলেছে। তারপর সহজ সরল গ্রাম্য বাগ্‌দি বুড়িকে ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে। এবার সেই আসামীকে ধরে আনা হলো এবং কঠোর সাজা দেওয়া হলো।' অনেকক্ষণ ধরে বিলে— নরেন ভাইকে এই গল্পটা বলতেন। এমনকী আমেরিকা-ইংল্যান্ড গিয়েও স্বামীজী গ্রাম-বাংলার মানুষের এই গল্প এমন সুললিত কণ্ঠে বলতেন, যা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই নরেন এই গল্প বলার বাগ্মিতা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ছবিটা আরও ঝকঝকে হয়ে উঠেছিল। শিকাগো বক্তৃতা সভায় দৃপ্ত সন্ন্যাসীর আলো দিগ্‌বিদিক জুড়ে ঠিকরে উঠেছিল।

জহর মুখোপাধ্যায়

ভারতের পথে পথে

কার্গিল

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত শহর কার্গিল। এটি লাদাখের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। লাদাখের সদর শহর লে-এর পরে এর স্থান। দুর্গম জেজিলা পাস অতিক্রম করে এখানে যেতে হয়। ১৯৯৯ সালে মে মাসে পাকিস্তানি ফৌজ সীমান্তরেখা পেরিয়ে এই শহরে প্রবেশ করলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান এই যুদ্ধের দায় কাশ্মীরি স্বাধীনতাপন্থী জঙ্গিদের উপর চাপিয়ে দেয়। অবশেষে জুলাই মাসে পাকিস্তান এই অঞ্চল থেকে ফৌজ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় ও পরাজয় স্বীকার করে। কার্গিল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কার্গিল ও দ্রাস বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

এসো সংস্কৃত শিখি

তস্মৈ বিষয়: নিবেদিত: কিম্ ?
তাঁকে বিষয়টা বলেছ কি?
তস্য স: অত্যন্তং প্রীতিপাত্রম্।
সে তো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।
ভবতা হৃদং ন কর্তব্যম্।
তোমার এটা করা উচিত নয়।
যদি স: স্যাত্.....।
যদি সে থাকতো.....।
অবশ্যম্ আগন্তব্যং, ন বিস্মর্তব্যম্।
অবশ্যই আসবে, ভুলবে না।

ভালো কথা

কর্মযোগী

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্য টানা রিক্সা। রঙ করা বড় বড় চাকা। দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু যারা এই রিক্সা চালায় তারা খুব গরিব হয়। কারণ, অটো-ট্যাক্সিতে মানুষ বেশি চড়ে। এই রিক্সাওয়ালাদের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে। সেদিন রাতে একটি নেমন্তন্ন ছিল আমাদের। মা-আমি অনেক রাত করে ফিরলাম একটি টানা রিক্সা করে। আমাদের ভাগ্য ভালো অত রাতেও আমরা রিক্সা পেয়ে গেছি। পরের দিন সকালে আমার স্কুল। সকালে উঠে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো গত রাতের সেই রিক্সা। বেশি রাত করে ঘুমোলে আমরা দেরি করে ঘুম থেকে উঠি। কিন্তু এই রিক্সওয়ালা গতকাল অতরাত পর্যন্ত রিক্সা চালানোর পরও আবার সকালে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সত্যিই প্রত্যেক মানুষই কর্মযোগী। সে যে কাজই করুক না কেন।

পারমিতা দে, বাগবাজার, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) কা বে ন বি	(১) যো প্র গি তি তা
(২) ন ত ছপ	(২) ত গো ন্দ গী বি

২৬ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) গণদেবতা (২) অভিনন্দন

২৬ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) নিবেদিতা (২) বন্যাত্রাণ

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভজিৎ পাল, অষ্টম শ্রেণী, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।
(২) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৩) অর্কমিত্রা রায়, মকদমপুর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৪

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো শারদীয়া

দেবী প্রসঙ্গ : ড. সীতানাথ গোস্বামী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - বিপরিণাম
সুমিত্রা ঘোষ - চিরন্তন কাহিনি

ইতিহাসের আলোয় উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - সম্ভবামি

গল্প

এষা দে, শেখর বসু, রমানাথ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
সন্দীপ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, বিরাজনারায়ণ রায়

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক

প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, এম জি বৈদ্য,
স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, অমলেশ মিশ্র, দেবীপ্রসাদ রায়, সৌমেন নিয়োগী,
রবিরঞ্জন সেন, রজত পাল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ

পুরাণ কথা

বিজয় আঢ্য

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা